প্রথম প্রকাশ
২২ শ্রাবণ ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক
রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়
শিবরাণী প্রকাশনী
৮বি/২ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক
বঙ্কিম চন্দ্র পাল
৯৪/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রিট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ লিপি
চারু খান

উৎসর্গ

যারা কবিতা পড়েন তাদের সবাইকে

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠার নাম
প্রেমেন্দ্র মিত্র । ছোঁয়া	২৫
সমর সেন । প্রেম	২৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায় । জেল খানার চিঠি	২৭
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । প্রেমবিহীন	২৮
শক্তি চট্টোপাধ্যায় । দেবতার গ্রাস	৩০
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত । বৈদেহী	৩১
অমিতাভ দাশগুপ্ত । মেরুন রঙের একা	৩৩
নবনীতা দেবসেন । ভাষান্তর	৩৫
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত । প্রেমের কবিতা	৩৬
দিব্যেন্দু পালিত । চলো ভালোবাসা	৩৭
অরুণ কুমার সরকার । মধ্যরাতে	৩৮
সুধেন্দু মল্লিক । বকুলকে ব্যক্তিগত	৩৯
তরুণ সান্যাল । এই স্বদেশের মতো	৪০
সুনীল বসু । সুধাপান	৪১
রাম বসু । অন্ধকার জাদুকরী	৪২
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । খেলা	৪৩
শঙ্খ ঘোষ । তুমি তো তেমন গৌরী নও	৪৪
রত্নেশ্বর হাজরা । কোনো দিগন্তের কাছাকাছি	৪৫
রথীন্দ্র রায় । ডায়াসের বক্তা	৪৬
দেবাশীষ রায় । তৃপ্তি	৪৭
চিত্ত মাহাতো । ২রা অকটোবর এবং তারপর	৪৯
দীপঙ্কর নন্দী । শতাব্দী	৫০
মীনা ভট্টাচার্য । আলেয়ার মত তুমি	৫১
শরজিত মুখোপাধ্যায় । দেবতার দুটি পায়ে	৫২
শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল । শাশ্বত	৫৩
প্রত্যুষ পড়ুয়া । অন্ধকারে ডুবে আছে পথ সব	৫৪

নলিনী কান্ত চক্রবর্তী। যদি, তা না হতো ৫৫
আলোক সরকার। দাউদাউ ৫৭
আনন্দ বাগচী। তামাশা ৫৮
বিশ্বজিৎ তপাদার। কাঁটার আসনে আছে বিষের ভাণ্ডার ৫৩
বিনয় মজুমদার। ভালোবাসা দিতে পারি ৬০
শুদ্ধসত্ত্ব বসু। তবুও আকাশ পদ্ম ৬১
তপন গোস্বামী। মহীরুহ ৬২
তুলসী মুখোপাধ্যায়। দিনযাপনের কবিতা ৬৩
শিবশম্ভু পাল। বিবাহের দিন ৬৫
কেদার ভাদুড়ী। গোপাকে ৬৬
অরুণ বাগচী। বার কী ৬৭
শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়। শুনলাম ৬৯
শ্যামল কান্তি দাশ। তোমার পন্থা ৭০
কার্তিক মোদক। হঠাৎ ছায়ার মত ৭১
গোপাল ভৌমিক। ব্যাধি ৭২
মৃনাল কান্তি দাশ। ভুল ৭৩
অরুণ মিত্র। পাতা উল্টে গেল ৭৪
গৌরাঙ্গ ভৌমিক। দিন লিপির একদিন ৭৫
তারাপদ রায়। নষ্ট করছেন ৭৬
রতনতনু ঘাটী। প্রিয়তম ডাক ৭৭
পূর্ণেন্দু পত্রী। অমিতাভর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তা ৭৮
সুরজিৎ ঘোষ। ভ্রমণ কাহিনী ৮০
কবিরুল ইসলাম। একবারই শিশির ঝরে একজন্মে মাত্র একবার ৮১
মলয় সিংহ। ঝুলে পড়ি ৮২
সুনীল কুমার নন্দী। ভুলে যাও ভুলে যাওয়া ভালো ৮৩
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বসন্তকাল ৮৪
অনিলেন্দু চক্রবর্তী। এখন বকুল ৮৫
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্ভট চউপই ৮৬
শান্তনু দাস। নগ্নতার চেয়ে ৮৭
রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়। অনিদ্রা ৮৮
হুসাইন মহম্মদ এরশাদ। আকাশ চেরা বিদ্যুতের মত ৮৯

আহসন হাবীব। না বাউল, সংসারী নয় ৯০
শামসুর রহমান। রঞ্জিতাকে মনে রেখে ৯১
নির্মলেন্দু গুণ। মুজিব ৯৪
বেলাল চৌধুরী। অপাংক্তেয় কবিতাগুলির প্রতি ৯৫
আসাদ চৌধুরী। ফুঁ দিয়ে নেভাতে চায় ৯৮
রফিক আজাদ। রফিক আজাদ ৯৯
কাজী রোজী। সত্তায় সকীয়তায় ১০২
হেলাল হাফিজ। অশ্লীল সভ্যতা ১০৩
জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ। ভিন্ন স্বভাব ১০৪
রবীন সুর। পূজোর কাবতা ১০৫
অজয় দাশগুপ্ত। সামনে সোনালী আলো অফুরন দিন ১০৬
প্রণব কুমার আইচ। সুচরিতাকে ভালবেসে ১০৮
শৌনক বর্মন। নারী ১০৯
পারুল ঘোষ। একা নই ১১০
পূর্ণেন্দু বিকাশ মণ্ডল। কামনায় ১১১
ভরত ঘোষ। হাঁটু গেড়ে পৃথিবীর কাছে ১১৩
গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিতর ঘর ১১৪
অসিত দে। প্রতীক ১১৫
কিরণ শঙ্কর মৈত্র। সময় ১১৬
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী। রোজনামচা ১১৭
সরল দে। বাসা ১১৮
রাখাল বিশ্বাস। কেউ জেগেছো, কেউ ১১৯
রবিদাস সাহারায়। কোন খেদ নেই ১২০
মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকালের শব ১২১
দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়। কবিসভা ১২২
সৌরীন গুহ। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ১২৩
পরিমল চন্দ্র নাগ। দু'টি কবিতা ১২৪
শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে ১২৫
শুভব্রত রায়চৌধুরী। রেল স্টেশনের যুবক ১২৬
গৌতম কর। পথ ব'লে দাও কোন্‌খানে ১২৭
দীপক কুমার দাস। মা ১২৮

মঞ্জু কুণ্ডু / কথাগুলো যদি	১২৯
প্রমোদ রঞ্জন সাহা / দুটো কবিতা	১৩০
গৌতম রায় / সোমা নামে মেয়েটি	১৩৩
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় / বন্ধু	১৩২
নন্দলাল সেনগুপ্ত / সারারাত	১৩৩
মালতী পাল / একটু উষ্ণতায়	১৩৪
মহঃ রেজুয়ান আলি / প্রবাসী	১৩৫
কৃষ্ণকলি সিংহরায় / বদলায় না স্বপ্নেরা	১৩৬
কানাইলাল বিশ্বাস / অহল্যা জাগে	১২৯
অজন্তা সেনগুপ্তা / কায়া ও ছায়া	১৩০
ইলা সেনগুপ্ত / একটি কবিতার জন্ম	১৩১
দেবাশিস সরকার / আশীর্বাদ	১৩২
উমাশংকর / মালবিকা এবং এক অনিকেত প্রেম	১৩৩
সুশান্ত ঘোষ / ছুটে যাই	১৩৪
সনৎ চন্দ্র চন্দ্র / কোথায় মানবতা	১৩৫
অজিতেশ নাগ / রোজের সকাল	১৩৭
মীনকেতন বন্দ্যোপাধ্যায় / বসুন্ধরা	১৩৮
অনুপ কুমার কুইলা / ইচ্ছে করে, ল্যাং মারি	১৩৯
জয়ন্তী রায় / বৃক্ষের শিকড়ে যাব	১৪০
নগেন্দ্র কুমার মিত্রমজুমদার / শুভমুক্তি	১৪১
টোকন কুমার মহাপাত্র / শিক্ষা দাও	১৪২
অনিতা চট্টোপাধ্যায় / কবিতাকে চেয়ে	১৪৩
প্রলয় মজুমদার / সুন্দর তুমি থাকো	১৪৪
ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী / রাত্রির ব্যথা	১৪৫
রামানন্দ সাও / ভাল-মন্দ	১৪৬
কল্যাণ কুমার বৈতালিক / বংশধর	১৪৭
সত্য গুহ / যাবো, কে না যাবে	১৪৮
গৌতম কুমার ঝা / জীবনের রং	১৪৯
তাপস অধিকারী / সাবাস হে	১৫০
ললিত কুমার মাইতি / নিঃশব্দ প্রার্থনা	১৫১
মধু বর্মন / দুঃখবাদ	১৫২

পূর্ণিমা মৈত্র (চক্রবর্তী)। পন নেবোনা, পন দেবোনা ১৫৩
গোপাল চক্রবর্তী। ঘরে ফেরা ১৫৪
উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু কিছু কবিতা এবং ভালবাসা ১৫৫
সলিল ভৌমিক। কবিতার অভিশাপ ১৫৬
রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্মোক ১৫৭
দিলীপ রায়। দুঃখের রঙীন মাছেরা আমার ১৫৮
সৈয়দ ইয়াসীর আরাফাত। রক্তিম স্থাবর ১৬০
জহর মিশ্র। মডেল ১৬১
অভ্র মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ ১৬২
বিশ্বনাথ চৌধুরী। যুগযন্ত্রণা ১৬৪
গুরুপদ ভট্টাচার্য। প্রকৃত মানুষ ১৬৫
নাগ সেন। দহন ১৬৬
লক্ষ্মী মণ্ডল। রঙীন প্রতিক্ষা ১৬৭
অবনি ভট্টাচার্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৬৮
শান্তি মুখোপাধ্যায়। কঠিন সংযমে ১৬৯
অজয় চট্টোপাধ্যায়। দুচোখের আলোয় শূন্যতা ১৭০
কঙ্কণ সরকার। তোমার শরীর শুধু ১৭১
মৃণাল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। নারী ১৭২
স্বপন রায়। সাংসারিক ১৭৩
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আমি আছি ১৭৪
শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ফরমায়েসী ১৭৫
অশোক কুমার রায়। কোথা গেলে ১৭৬
ভারতী রঞ্জন নিত্যগোপাল সামন্ত। আর কভু চলিব না ১৭৭
আশুতোষ দাশ। এই শ্রাবণের ভিতর দিয়ে ১৭৮
কুমুদ চক্রবর্তী। দুঃখ হ'তে সুখ ১৭৯
হৃষীকেশ মাইতি। নরকে ১৮০
রণজিৎ কুমার পাত্র। ছেঁড়া ইতিহাস ১৮১
দিশারী মুখোপাধ্যায়। বারোটার পর ১৮২
জ্যোতির্ময় হুই। একজন শিক্ষক, ক্যানসার এবং শোকসভা ১৮৩
শক্তিপদ রায়। মিছিল ১৮৫
নৃপেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ। ক্ষমা ১৮৬

মধু রাজোয়ার। পাতা ১৮৭
অশোক কুমার দাস। সুখের টানে ১৮৮
মদন গোপাল গোস্বামী। মুক্তি ১৮৯
উত্তম কুমার দেবনাথ। স্বপ্নে সোনার হরিণ ১৯০
স্বপ্না সোম। শরতে প্রকৃতি ১৯১
দিলীপ কুমার দত্ত। পরিব্রাজকের বেশে প্রেম ১৯৩
মধুমিতা দাশগুপ্তা। ঝরা পাতা ১৯৪
অমিত কর্মকার। সু, তোমার শুভেচ্ছার উত্তরে ১৯৫
সিদ্ধার্থ শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। বিদায় ১৯৬
অজয় দাশ। ঈশ্বর ১৯৭
দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বপ্ন দেখি জীবনের ১৯৮
রাজা ব্যানার্জী। পরীরা সব ঘুমিয়ে আছে ১৯৯
সুবীর মুখোপাধ্যায়। একান্ত আমার ২০০
আশীষ শর্মা। ঝড় ২০১
সুবীর ঘোষ। চাইবে না বরাভয় ২০২
প্রদীপ চৌধুরী। হাজার বছর পরে ২০৩
শ্যামলী মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য। শাহবানু ২০৪
কালীপদ পাল। ইচ্ছা ২০৫
কাসেম আলি বিশ্বাস। আজকের নেতা ২০৬
তুষার কান্তি যন্নিগ্রহী। খসে পড়ে ২০৭
দেবকী পাত্র। রবীন্দ্রনাথ : ওরা কেমন আছে? ২০৮
বিনয় কৃষ্ণ জানা। তবুও রূপ ঝরে ২০৯
সন্দীপন বিশ্বাস। দ্বৈত ভূমিকায় ২১০
হিমাংশু কুমার মৈত্র। মহাশান্তি ২১১
সুব্রত জানা। বুমেরাং ২১২
মহানন্দ ধর। কবিতা ২১৩
অজিত কুমার চক্রবর্তী। আজ-কাল-পরশুর-ভিতর ২১৪
দীপেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। অভিনন্দন ২১৫
তাপস কুণ্ডু। সোনালী গোধূলির অপেক্ষায় ২১৭
দিলীপ কুমার দাস। আর কখনো না ঝ'রে ২১৮
অপূর্ব কৃষ্ণা দাস। মহাকালের ভেরী ২১৯

মানিক চন্দ্র দাস। ফুটপাত ২২০
রীতা দত্ত। বাসনা ২২১
মোঃ আসরাখুল হক। বঞ্চিতের ক্ষোভ ২২২
রূপশ্রী দত্ত। মনকে ফেরাই ২২৩
মণীশ ভটাচার্য্য। আমার শুভক্ষণ ২২৪
হরিদাস ঘোষ। চেতনার মহাকাশ থেকে ২২৫
শোভনা সেন। অপারেশন ২২৬
মথুর বসু মল্লিক। রাত্রি ২২৭
রমাকান্ত করণ। একটা কিছু দাও ২২৮
অরুণ দেব। রক্ত রাঙা পলাশ ২২৯
ত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায়। রাজার রাজা ২৩০
তুষার ভট্টাচার্য। শক্তিমান হাতিয়ার ২৩১
অরিজিৎ সিংহ। কঠিন বাস্তবের পরে ২৩২
গোপাল মল্লিক। অন্তরাত্মা লুকিয়ে নেই ২৩৩
প্রদীপ দে। খেয়াল ২৩৪
মিহির কান্তি রায়। সব দিতে পারি যদি ভালবাসো ২৩৫
বিজয় কুমার ভক্ত। শ্রেষ্ঠ বিরহের কবিতা লেখো ২৩৬
মাখন লাল বিবাড়। জীবনের কি প্রেম ছিল পক্ষকাল ২৩৭
মণিকা দাস। সুবাসিনীর হাসি অথবা আশ্চর্য কলকাতা ২৩৮
অমর নাথ ভদ্র। জীবনের ভেতর জীবন ২৩৯
কুঞ্জ বিহারী দাশ। দৃশ্যপট ২৪০
শিশির গুহ। তবুও প্রেম ২৪১
কাঞ্চন কুন্তলা মুখোপাধ্যায়। সময়গ্রন্থি ২৪২
বিনোদ বেরা। আমি সেই ২৪৩
ডাঃ অমূল্য ভূষণ চক্রবর্তী। যে কথা হয় নি বলা ২৪৫
পঙ্কজ গুহ। ভালবাসা ছড়িয়ে দাও ২৪৭
অতুল রায়। যদিও জীবন ২৪৮
দীপালি দে সরকার। ধূলোর আলোয় বসে ২৪৯
শ্যামল ঘোষ। কোথায় পাবে জননী তা? ২৫০
বঙ্কিম পাল। স্থানাভাব ২৫১
মধুসূদন চাবরী। অন্ধের গান ২৫২

মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় । পথের শেষে ২৫৩
রবীন্দ্র গোপ । খুনির আত্ম সমর্পণ ২৫৪
মাখনলাল প্রধান । স্বপ্ন ও বাস্তব ২৫৫
খোকন দাস । পদ্মার স্মৃতি কলরব ২৫৬
রমানাথ চট্টোপাধ্যায় । নতজানু দৌবারিক ২৫৭
প্রকাশ কর্মকার । কাঠুরিয়া ২৫৮
প্রসেনজিৎ মাইতি । শীতার্ত উটোপিয়া ২৫৯
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এখনো আসা যায় ২৬০
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল । আদিম প্রশ্ন ২৬১
দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । শরীরের কাছে ২৬২
পরিমল রায় । আজ এই জ্যোৎস্নার ২৬৩
হীরেন্দ্র কুমার মিত্ররায় । আয়রে খুকু আয় ২৬৫
সরোজ কুমার পাণ্ডে । সভ্যতার রূপ ২৬৬
মধুসূদন ভট্টাচার্য । কবিতায় এমত্রয়ডারি ২৬৮
অজিতেন্দ্র সিংহ । প্রান্তিক ২৬৯
মানসী সিন্হা রায় । চিঠি ২৭১
অশোক কুমার চক্রবর্তী । এই ঘর ২৭২
রূপক চক্রবর্তী । সর্বস্ব সুখ ২৭৩
মৃণাল কান্তি দাসগুপ্তা । কবিতার জন্য কবিতা ২৭৪
শম্ভুচরণ বর্মন । বের্তকুথা ২৭৫
নিত্য গোপাল তরফদার । অঙ্কুরিত হবার সুযোগ ২৭৬
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বৈমাত্রের প্রেম ২৭৭
লীনা পাঠক । সেই দিন আসবে না ফিরে ২৭৮
সৌমিত্র ভট্টাচার্য । রাজতিলক ও সে ২৭৯
রতন কুমার রায় । পূজা ২৮০
শান্তিময় শীলদাস । পন ২৮১
অধীর কুমার দত্ত । ঈশ্বর প্রণিধান ২৮২
আব্দুল্ সালাম । বেকার তোমার পাই ২৮৩
দীপঙ্কর বিশ্বাস । যদি তোমায় পাই ২৮৪
স্বপন সিংহ । এবারের মত শেষ করে পালা ২৮৫
কৃষ্ণকিশোর সরদার । লিখে নিও ২৮৬
বেণু দেবী । বাস্তব ২৮৭

গৌতম চৌধুরী । মানসী ২৮৮
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ভাত ২৮৯
গৌতম সাধুখাঁ । এ কালের আফ্রিকা ২৯১
উজ্জ্বল কুমার । প্রেম করি ২৯২
অশোক বিশ্বাস । অনুভূতি ২৯৩
কল্লোল দত্ত । আয়না ২৯৪
গৌতম কুমার দে । ধর্ষন ২৯৫
কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ । বীভৎস ২৯৬
আশিস সোম । শুভকামনা ২৯৭
প্রভাত লাহা । পাখি ডাকে নিচুস্বরে ২৯৮
সুজন সারথি কর । পথ নেই ২৯৯
সোমনাথ মুখোপাধ্যায় । গাংশালিকের দল ৩০০
বিপ্লব রঞ্জন ঘোষ । নিহত আত্মার প্রতি ৩০১
কালীপদ দাস । জানি না ৩০৫
বিনোদ বিহারী বর্মণ । অথচ ৩০৬
সাইফুল মোল্লা । অসহায় এক কিশোরী ২৮৯
মায়া দত্ত গুপ্তা । কিছু চাইতে যেওনা ২৯০
উত্তম রায় । মগ্ন চলাচল ২৫১
চন্দন কুমার বৈদ্য । তেপান্তরের মাঠ ২৯২
হেমন্ত মাইতি । স্মরণিকা ২৯৩
সুব্রত চক্রবর্তী । রবীন্দ্রনাথ ২৯৫
জয়সূর্য ভট্টাচার্য । এ বছরে বলো ২৭৬
প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । ফিনিক্স ২৯৭
তাপস মুখার্জী । রাত্রির তপস্যা ২৯৮
শিবানী গুহ । ফাগুন এল অসময়ে ২৯৯
তন্ময় কুমার সোম । সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা ৩০০
কিরণময় গঙ্গোপাধ্যায় । ব্যাঙের আধুলি ৩০১
অবিনাশ রায় । জানা হয়ে গেল ৩০২
পিনাকী রঞ্জন কর্ম্মকার । আবেদন নিবেদন ৩০৩
মধুসূদন সিংহ । কথা দিয়ে ছিলে তুমি ২০৭
দিলীপ কুমার সেন । ভালোবাসা আসছে ৩০৯
বিদ্যুৎ ঘোষ । আগামীর দৃঢ় অঙ্গীকার ৩১১

ডালিয়া সরকার। প্রত্যক্ষ করে এমন ৩১২
শুভময় চার। জেনেও ৩১৩
বাসুদেব চক্রবর্তী। দুঃখের মিছিলে ৩১৪
শান্তনু প্রামাণিক। ছিল এক দীর্ঘ মরন ঘুম ৩১৫
অরুণ কুমার ঘোষ। ব্যাখ্যা ৩১৬
বিরাম সরকার। শিল্পীর কান্না ৩১৭
শশাঙ্ক কুমার সরকার। ফিরে আয় ৩১৮
পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশের মানচিত্রটা কোথায় ৩১৯
শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়। বাণী বন্দনা ৩২০
বিবেকানন্দ পাত্র। পনের উপমাতে একটি কবিতা ৩২১
পাঁচু গোপাল রায়। ঈশ্বরের প্রতি অপমান ৩২২

চিত্রসূচি

(১) অন্নদা মুন্সী (২) বিকাশ ভট্টাচার্য (৩) যামিনী রায় (৪) দেবব্রত চক্রবর্তী (৫) কুমকুম মুন্সী (৬) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (৭) চারু খান (৮) নরেন চন্দ্র দে সরকার (৯) মণিকা দাশ (১১) বিশ্বজিৎ রায় (১২) লালু প্রসাদ সাউ (১৩) দীপক মুখোপাধ্যায় (১৪) প্রদীপ কর্মকার (১৫) চারু খান (১৬) সমীর ঘোষ।

ছোঁয়া

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সারাদিন ঘেষাঘেঁষি মানুষের ভিড়ে
কত ছোঁয়া লাগে সারা হৃদয়ে শরীরে।
রাত হ'লে একা ঘরে এসে
একে-একে সব দাগ মুছে দেখি শেষে,
একটি গভীর ছোঁয়া তবু লেগে আছে
হৃদয়ের একেবারে কাছে।
যে শহরে শুধু ধুলো ধোঁয়া
সেখানে কোথায় এই ছোঁয়া
লেগেছিলো কার ?
কত ভাবি তবু মনে পড়ে নাকো আর।
অপরিচিতের এই উদাসীন অচেনা নগরে
কাটালাম বহুদিন প্রবাসীর মতো,
শুনেছি অনেক নাম, ভুলে গেছি কত,
একা-একা হেঁটে-হেঁটে, গেছি কত দূর
তবু এতদিন দেখা পাইনি সে একটি বন্ধুর।
চোখ তারে চেনে নাকো
মন তার জানে না প্রমাণ,
চেতনার অন্ধ পিঠে শুধু
আজীবন বয়ে ফিরি সুগোপন এক অভিজ্ঞান।
অগণন মানুষের ভিড়ে
কখন সে-অভিজ্ঞান হ'লো বিনিময়
আনমনা জানে না হৃদয়।
তারপরে নগরের দুটি বাতায়নে
একটি অতল রাত্রি বয় দুটি মন থেকে মনে।

প্রেম

সমর সেন

বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা।

আর মাঝে মাঝে আকাশে হলুদ রঙের অদ্ভুত চাঁদ ওঠে,
চঞ্চল বসন্ত কাঁপে গাছের পাতায়,
আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ
পড়ে থাকে অলস স্বপ্নের মতো।

সমস্ত দিন, আর সমস্ত রাত্রি ভরে
তোমাকে পাবার বাসনা
বিষাক্ত সাপের মতো।

জেলখানার চিঠি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নতজানু হয়ে আমি চেয়ে আছি মাটির দিকে
উজ্জ্বল নীল ফুলের মঞ্জরিত শাখার দিকে আমি তাকিয়ে
তুমি যেন মৃন্ময়ী বসন্ত, আমার প্রিয়তমা,
আমি তোমার দিকে তাকিয়ে।

মাটিতে পিঠ রেখে আমি আকাশটাকে দেখি।
তুমি যেন মধুমাস, তুমি আকাশ
আমি তোমাকে দেখছি প্রিয়তমা।

রাত্রির অন্ধকারে গ্রামদেশে শুকনো পাতায়
আমি জ্বালিয়ে ছিলাম আগুন
এই আমি স্পর্শ করছি সেই আগুন
নক্ষত্রের নীচে জ্বালা অগ্নিকুণ্ডের মত তুমি
আমার প্রিয়তমা, তোমাকে স্পর্শ করছি।

প্রেমবিহীন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে
এখন হৃদয় শূন্য, যেন রাত্রির রাজপথ
ঝকমক করে কঠিন সড়ক, আলোয় সাজানো, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে
প্রতীক্ষা আছে আঁধারে লুকানো, তবু জানি চিরদিন
এ পথ থাকবে এমনি নিখুঁত, কেউ আসবে না, জনহীন প্রেমহীন
শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে।

রূপ দেখে ভুলি কী রূপের বান, তোমার রূপে তুলনা
কে দেবে ? এমন মূঢ় নেই কেউ, চক্ষু ফেরাও চক্ষু ফেরাও
চোখে চোখে যদি বিদ্যুৎ জ্বলে কে বাঁচাকে তবে ? এ-হেন সাহস
নেই যে বললো, যাও ফিরে যাও
প্রেমহীন আমি যাও ফিরে যাও
বটের ভীষণ শিকড়ের মতো শরীরের রস
নিতে লোভ হয়, শরীরে অমন সুষমা খুলো না
চক্ষু ফেরাও চক্ষু ফেরাও।

টেবিলের পাশে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালে তোমার
বুক দেখা যায়, বুকের মধ্যে বাসনার মতো
রৌদ্রের আভা, বুক জুড়ে শুধু ফুল সম্ভার,—
কপালের নিচে আমার দু'চোখে রক্তের ক্ষত
রক্ত ছেটানো ফুল নিয়ে তুমি কোন্ দেবতার
পূজায় বসবে ? চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও, শত্রু তোমার
সামনে দাঁড়িয়ে, ভীরু জল্লাদ, চক্ষু ফেরাও !

তোমারও রূপ মূর্ছিত করে আমার বাসনা, তবু প্রেমহীন
মায়ায় তোমায় কাননের মতো সাজাবার সাধ, তবু প্রেমহীন
চোখে ও শরীরে একে দিতে চাই নদী মেঘ বন, তবু প্রেমহীন
এক জীবনের ভালোবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি খুব অবেলায়
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ।

দেবতার গ্রাস

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এও জানি কাছে আছো, এত কাছে কে থাকে আবার
সুখের চন্দন চৌকি বুকে রেখে বসেছো উপরে—
আমার দুঃখের ভগ্নী, একই বৃন্তে বধির মক্ষিকা,
বসন্ত পলাশে লাল বনে-বনে ফেরোনি কৌতুকে।

ফেরাও, মূর্ছিত হই মুখ ধ'রে অবয়ব ধ'রে
বসন্ত গবাক্ষ পথে ডুবে যাই দু-জন বনানী—
অলিন্দে-অলিন্দে ফুটে, নৃত্যে রুগ্ন ব্যথিত জানালা
খুলে দিয়ে কথা বলি, কথা বলি সাম্রাজ্যে, হৃদয়ে।

এও জানি কাছে আছো এত কাছে কে থাকে আবার
একান্ত নিজের মতো ; অমূলক এ-বাসনা আর
যাবে না আমার যেন ক্ষুধা প্রেম অখণ্ড চেতনা।
শুধু দীর্ঘ করো মুখ, ছুঁতে চাই ফেরো ততোধিক
নীলিমা-নিখিলে, ব্যাপ্তে ; বসে রবো পাদমূল ধ'রে
দেবতা আমার, জন্ম ফুরালে সমাধিতলে যায়
দেবতা আমার, গ্রন্থ-স্মৃতি-শান্তি উন্মুখ সন্ধান।

জানি এত কাছে আছো—বামনেত্র দ্যাখে না দক্ষিণ
অথবা গোচর ছায়া দেখিবে না প্রতিচ্ছায়াভার
তা-ব'লে কি নাই নাই, প্রেম, বৃক্ষ গ্রাস করো মোরে।

বৈদেহী

অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রথম পাপ করার মতো বিবেক এল মনে,
চক্ষু বুজে সেই নারীকে নিলাম আলিঙ্গনে ;
সে কি হর্ষ, প্রাত্যহিক অপস্মার গুলি
পালিয়ে গেল পিলসুজের অঙ্গুলি হেলনে।

'আমায় তুমি অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী করো'
বলে আমি প্রথমে তার উরোগুঞ্জাহার
ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলাম জানলার বাহিরে :
কিন্তু তবু তার আনন্দ আকাশ গঙ্গায়।

'নির্মঞ্ছন করো আমায় তোমার চুলে'
বলতে গিয়ে অকস্মাৎ আমার স্বরলিপি
বিষাদ গুহায় অবরুদ্ধ : অনর্পিত তবু
বিস্ফারিত ইন্দুলেখা ব্যক্ত বাহু মূলে।

'আমার কাছে সূর্য আছে, কৃত্রিম শপথে
কাছে এনে দিলাম তাকে অন্তর্বেদনা,
তবু অবাক, আঁখি পদ্মে ছিল না ভৎর্সনা,
অনুরক্ত আকুতি ছিল রক্ত কোকনদে।

'তুমি আমায় এখনো কি নম্র কিশোর ভাবো ?'
এই বলে যেই অম্লাত মুখ বিকীর্ণ আঙুলে
স্নান করালাম, সে কি তৃপ্তি, অন্ধকারে হলো
সুবিনত গৃহদাহ সিতকঞ্জনাভ।

'কে তুমি ? কমলে কামিনী ? কার ঘরে বিদ্রোহ
সংঘটিত করে এল ?' এই বলে ফুকারি ;
আচম্বিতে চুম্বনের বৈশ্বানরে দেখি
আমায় রেখে গিয়েছে সেই স্বাবলম্বী নারী !

মেরুন রঙের একা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমরা দুজন চড়ব এখন
মেরুন রঙের একা।
সে-গাড়ি টানবে
ছোট্ট একটি টাট্টু।
তার রোগা পিঠে জুড়ে দেব একজোড়া
পোক্ত বাদামি ডানা,
শূন্যে ভাসব দোকায়।

আগে-ভাগে চলে গিয়েছে টেলিগ্রাম
সোনামুরা-রঙা মেঘে।
ভাতের গন্ধে ঠাসা আকাশের
গোর্খা লাইন পেরিয়ে
কাঁপা ছায়া ফেলে তিরপুণ্যির মাঠে
মেরুন রঙের একায়
সব উজিয়ে যেতেই হবে—
চলেছি জোড়ায়
ঝাঁপ দিতে ভরা নীলিমার মোচ্ছবে।

চক্রী পাহাড়, গূঢ় অভিলাষে ঠাসা অরণ্য পেরিয়ে
ভাখো, কি সাবাস ছুটছে আমার টাট্টু!
আহা, কতকাল তাকে ডাঁটো করে তুলেছি গোপন স্বপ্নে,
তার রোগা পিঠে বুনেছি ডানার ইচ্ছে।

কে হুলো বাড়াও ?   অভাব সব তো থায় না,
অসম্ভবের বায়নায়
সাজানো তাসের শয়তানি ছিঁড়ে
লাফ দিয়ে ওঠে টেক্কা,
তুখোড় কদমে কদমে
তারামণ্ডল মাড়িয়ে ছুটেছি
মেরুন রঙের একায় ।

ভাষান্তর

নবনীতা দেবসেন

এসো, চুম্বন দাও, বলো দূরে যাবে না কখনো
এসো, হাতে তুলে নাও
সমস্ত গোধূলি—

এসো, চুম্বন দাও, তারপরে বলে সেই কথা
যেকথা আমার ঠোঁট ছেড়ে গেছে বহুকাল হলো
এসো চুম্বন দাও।

তারপরে শিরায় শিরায়
সেই শব্দে অগ্নিময় নৈঃশব্দ্যের প্রতিধ্বনি তুলি
ধ্বনি; প্রতিধ্বনি তুলি অনুচ্চার অব্যক্ত বাক্যের
শ্রবণের গহনে বাজাই
শোণিতের নিহিত সংলাপ

এসো, চুম্বন দাও।
সেই ভাষা তোমাকে শেখাই
জিহ্বায়, ওষ্ঠাধার, শিরা-ধমনিতে,
শ্রবণে যা শাশ্বত অধরা—
রক্তে কলস্বরা॥

প্রেমের কবিতা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

এই একটা জায়গায় কেমন
হিসেব মিলছে ব'লে মনে হয়।

তুমি কাছে আছো ব'লে
কাঠবেড়ালির মতো শরীরের অংশ লাফ দেয়—
বিশ্বাস ক'রো না, বুঝে নাও,
এই একটা জায়গায় আমার
বেঁচে থাকা জানালা খোলার মতো স্বাভাবিক,
সপাট জানালা ॥

চলো ভালোবাসা

দিব্যেন্দু পালিত

ঐ নারী লালসার পাঁক
ওর কাছে যেও না এখন।
ভালোবাসা যূথবদ্ধ থাক,
খোঁজ শর-সন্ধানের ক্ষণ।

পরবর্তী নারীটির দাবী—
চিৎকৃত তুষার; নয় রোদ।
এই চাবি নয় সেই চাবি
যার ত্বকে বাজাবে সরোদ।

তৃতীয়া সে নেহাতই বালিকা
যে-কোন স্পর্শে খোঁজে মানে।
ছবিতে পরায় রাজটীকা,
সব ফুলই ফোটায় বাগানে।

অন্যথায় দাম বিশ সিকে—
একটু এগোলে পোয়াবারো।
হানো চোখ ভ্রূভঙ্গময়ীকে,
চটপটে হাতে প্রেম সারো।

চলো ভালোবাসা, একা হাঁটি
যেদিকে দু'চোখ যায়; হাওয়া
চারিদিকে ফেটায় দোপাটি
প্রেম তো যাওয়াই, শুধু যাওয়া।

মধ্যরাতে

অরুণকুমার সরকার

প্রেয়সী তোমার যৌবন যেন বৈশাখী খর বায়ু
পুড়ে যাই আমি বৃক্ষ রিক্ত-পাতা।
দু'বাহু বাড়াও, প্রাণ দাও নব জলধারা সিঞ্চনে
বিদূরিত হোক ভয়ের ধুলোর গ্লানি।

প্রেয়সী, তোমার দুটি চোখ যেন মশালের আহ্বান
ছুটে যাই আমি পতঙ্গ ক্ষণজীবী।
অবগুণ্ঠনে প্রদীপ জ্বালাও মৃণ্ময় মমতার
বিদূরিত হোক মৃত্যু ভয়ের গ্লানি।

প্রেয়সী তোমার এলোচুলে যেন অর্বুদ হিজিবিজি
ব্যর্থ আমার চেতনার উদ্যম।
ধীরে কাছে এসো, বাঁধো কুন্তল দীঘি সুশীতল স্নেহে
বিদূরিত হোক আত্মক্ষয়ের গ্লানি।

প্রেয়সী তোমার দুটি বাহু যেন সুদূরের দুটি পথ
মিলেছে আমার বহুদিনকার ঈপ্সিত প্রান্তরে।
দু'বাহু বাড়াও প্রেমের করুণ মধুর আলিঙ্গনে
বিদূরিত হোক একাকিত্বের গ্লানি।

বকুলকে ব্যক্তিগত

স্বধেন্দু মল্লিক

বকুল আমাকে তুমি চিঠি দিয়ো রোজ।
ত্রিকূট পাহাড়ে ঘন জঙ্গলে জঙ্গলে
কেমন করেছে ভয়, টমটমে কতোদূর গেলে
এসব জানিয়ো।

এখানে আমার খুব কুঁড়েমিতে চলেছে সময়।
ঘুমন্ত গাভীর চোখে যেন ম্লান মাছি বসে আছে।
বকুল, আমার আর গভীরতা নেই প্রয়োজন
দ্রুততা স্থিরতা নেই স্থাবর জঙ্গম।
সেবার পাইনি ছুটি, গম্বুজ ঘরের
ঘড়ি শুধু বৃথা ছুটে গেলো। তুমি কি দাঁড়িয়েছিলে ?
কতোক্ষণ ? সাতটা পর্যন্ত ! সব মিছে কথা !
আমাদের বাসাবাড়ি তুলে দেয়া হয়েছে বকুল !

ভালো লাগে এই সুখ এই ভ্রান্তি মেঘে ওড়া লঘিমা দ্রাঘিমা।
মেঘের ওপারে রোদ জলবিম্ব কার্ণিশে আগাছা। ভালো থেকো,
তোমার হাসির মতো ওই দূর ভ্রমণের মতো
রাতের ট্রেনের আধো ঢুলুনির মতো ভালো থেকো।

বকুল, আমাকে তুমি চিঠি লিখো রোজ।

এই স্বদেশের মতো

তরুণ সান্যাল

আমি তার বড়ো কাছাকাছি আছি, সে কি তার জানা ?
এই যে নিঃশ্বাস, এই স্পর্শবহ ত্বক, একে ধরা ছোঁয়া যায় ?
কেমন বুকের মধ্যে খরা জ্বালা হা হা করে, কে জেনেছে সে গর ঠিকানা ?
অথবা কখন নদী ভেঙে পড়েছিল ঢেউয়ে, না কী নারী, নিষ্ঠুর ডাঙায় !

কেমন আকাশ ছোঁয় দিগন্তকে, অথচ কি ছোঁয় ?
কেমন সমুদ্র ওঠে আকাশের দিকে, সে কি ওঠে ?
আপাত দৃশ্যের ভ্রমে সব মিথ্যা মাধুরীর রঙে বড়ো সত্য মনে হয়
যেমন জেনেছি প্রেম রমণী পাবার মধ্যে চুম্বন মন্থনে ফাটা ঠোঁটে।

দ্যাখো, ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে, যেন চাষী লাঙলের পিছে, ঐ নুয়েছে
আকাশ
ওকে বড়ে সুখ বলে, অমন সুখের জন্য আমিও পুরুষ যাই রমণীর কাছে,
দ্যাখো, এই বন নীলা বৃষ্টিতে প্রথম বাষ্প ফেটে ওঠে ঘন মহিমার মতো,
বলো তাকে উদাস নিঃশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস
বড়ো কাছাকাছি থাকি, যেমন শালের ডাল ছুঁয়ে যায় সেগুনের গাছে
সে কি তবু ছোঁয়া নাকি, কি জানি, আমার নারী অফুরাণ মাটি
এই স্বদেশের মতো, তার মেঘে কেশপাশ
ছড়িয়ে দাঁড়ালে জানি মৃত্তিকা আমার কাছে আমারি রমণী হয়ে আছে।





(8)

সুধাপান

সুনীল বসু

তুমি কেন এতো সুন্দর হলে ?
আমার পৃথিবী ভয়ের আগুনে জ্বলে ।

যদি আর কেউ তোমাকে এতটুকু ভালোবাসে
আমার পৃথিবী ভরে যায় দীর্ঘশ্বাসে ।

তুমি আর একটু যদি কম সুন্দর হ'তে
আমার জীবন ভরে যেতনা এমন
সন্দেহের ক্ষতে !

আমি চাই, তুমি আর কারও চোখে
সুন্দর হয়ো না
শুধু আমরে দু' চোখে অপ্সরী কিন্নরী
হয়ে থাকো
কালো রেশম চুলে তোমার নগ্নতা ঢাকো
তুমি কোনদিন আর কাউকে বলো না
ভালোবাসো !

শুধু আমি, হই আমি
রিক্ত করতলে তোমার মুখের চন্দ্র
একাকী ধারণ করি,
শুধু এই ইতিহাস জানুক শর্বরী ।

অন্ধকার জাদুকরী

রাম বসু

তোমার দেহের মৃত্যু হোক: মুক্তি হোক, নারী
আমাকে বিচূর্ণ করে লুপ্ত করো তোমার সত্তায়
বশীভূত উপাদানে, সেধা দিব্য আমার প্রভায়
ঋষি কণ্ঠে বলতে পারি : আমি শুধু তোমারি, তোমারি।

মাতাও, মাতাও তুমি উন্মাদক নাভি কুণ্ডলের
রোমাঞ্চ কস্তুরী গন্ধে, দাঁতে কাটো বিদ্যুতের হার
উন্মুখ জিভের ডগা গোলাপের মতো সুষমার
মুখের হীরক দীপ্তি রহস্যের দূর মণ্ডলের।

রক্তের আদিম স্পর্ধা ফুঁসে ওঠে মৃদু হাসো যদি
ফোটায় পদ্মের কুঁড়ি করপুটে বৈশাখী নিঃশ্বাস
রঙের ঘূর্ণির মুখে নির্যাসের নীরব উচ্ছ্বাস
পায়ে মাথা ফুটে হয় নিরবধি সময়ের নদী।

বিচ্ছিন্ন হিমার্ত আমি, যন্ত্রণায় তোমার আরতি—
গর্ভের মতন স্থির, হিংস্র হেন বর্ষার তরাই—
তোমার পাথুরে প্রায় মুখ রেখে আমি মরে যাই
অন্ধকার জাদুকরী, তুমি হও আমার নিয়তি।

খেলা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

খেলা পেতেছিলে তুমি রাস্তায়, ফুটপাতে, ইষ্টিশানে ;
খেলা পেতেছিলে সবখানে ।
এমন প্রকাশ্যে কেউ পাতে খেলা ? এই রকম খেলা ?

আজ সন্ধ্যাবেলা
লেগেছে রক্তের ছিটে আকাশের নীলে ।
রক্তের ভিতরে স্মৃতি, স্মৃতির ভিতরে সব সিন্দুকের চাবি
সেইদিকে তাকিয়ে তাই ভাবি ।

হোক খেলা, তবু সেই খেলার ভিতরে তুমি ছিলে ।

তুমি তো তেমন গৌরী নও

শঙ্খ ঘোষ

ভিখারী বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও
আমাকে কি নিতে চাও ? কত জরি ছাড়াও সুন্দরী
দুই হাতে ঝরাও ঝালর
আমাকে কি নেবে তুমি ? কখনো দেখিনি আগে চোখে
এত নিরুপম ভালোবাসা
তোমার মেদুর হাসি ধরেছি বিশ্বের পাশাপাশি
আনবী ছটায় জলে ঠোঁট
আমাকে কি নিতে চাও ? নেবে কোন শূন্য মাঠ থেকে ?
হয়ে তুমি অন্নপূর্ণা আজ।

চাও শুধু সম্পূর্ণ, একে একে সব নাও খুলে
মেদ মজ্জা হৃদয়ে মগজ
তারও পরে চাও আমি খোলা পথে হাঁটু ভেঙে বসে
হাতে নেব এনামেল বাটি
জড়াও রেশম দড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দিনে দিনে চাও পদতলে
ভিখারি বানাও, কিন্তু মনে মনে জানো কি কখনো
তুমি তো তেমন গৌরী নও !

কোনো দিগন্তের কাছাকাছি

রত্নেশ্বর হাজরা

একপাশে পাখি ডাকার মতো পাহাড় অন্যপাশে
একটা নদীর শুরু
মধ্যে একখণ্ড সমতল
বেলা দীর্ঘ হয় বেলা হ্রস্ব হয় সেখানে

মানুষের চেয়ে বয়সে বড় পক্ষীর ডিম
গড়িয়ে পড়ে পাহাড় থেকে

আর বৃদ্ধ ক্যাকটয়সে ফুল ধরে এখনেরা, বাজপাখির ভয়ে সাপ
ঘুরে বেড়ায় গর্তের কাছাছি।

আমি আছি
এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে এই কয়েকদিন
পরিত্যক্ত

একটা নৈশব্দ্যের মধ্যে নতজানু হচ্ছে অহমিকা একটা নৈশব্দ্যের
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে টুকরো টুকরো
অহংকার

আমার শেষ নৌকো আমাকে ফেলে চলে যায়
দিগন্তের দিকে

মানুষের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো এক পরিবেশ
প্রতিদিন গ্রাস করে একটু একটু—

একপাশে পাখি ডাকার মতো পর্বতমালা অন্তহীন
অন্যপাশে একটা নদীর শুরু
পরিত্যক্ত··········

ভায়ালের বক্তা

রথীন্দ্র রায়

ছ'টা বাজলো
কখন দূর্বার চূড়োয় শিশির জমেছে জানিনা
চিক্-চিক্ কোরছে হৃদয়
খুন হ'য়েছে ওপাড়ার মসজীদের আল্লাহ
এবং শংখ বাজার আগেই নিরুপমার সঙ্গে
প্রেম করলো প্রাচীন বৈষ্ণব সাধন দাস
কখন দূর্বা মাথা নুইয়েছে—।
আমি হেঁটে চলেছি তবুও গভীর রাত অবধি
হাঁটছি আজো ।।

তৃপ্তি

দেবাশীষ রায়

তৃপ্তি সে তো আমার প্রেমিকা
বড়ই মিষ্টি সে,
শান্ত, স্নিগ্ধা ও অপরূপা।
কিন্তু সে তো আমার হারিয়ে গেছে!
দেশ-দেশান্তর সমগ্র বিশ্বে
কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনা আমার তৃপ্তিকে।
বন্ধু বিবেক কে প্রশ্ন করি,
কোথায় পাব আমার প্রেমিকা তৃপ্তিকে?

বিবেকের দার্শনিক সুলভ বক্তব্যে
ঝরে পড়লো একগুচ্ছ উপদেশ,
তৃপ্তি হারিয়ে গেছে
সে এখন দুর্লভ
তাই তৃপ্তিকে উপলব্ধি কর,
কোন পূর্নিমার রাতে জ্যোৎস্নার মাঝারে
কোন নব প্রেমিক প্রেমিকার চোখ চাওয়া চাওয়ি,
মনের গোপন আঙিনায় দানা বেধে থাকা
ওদের না বলা কোন কথা বলার প্রয়াস।
কোন বাউলের মন মাতানো গান
তাদের চিন্তা বিহীন জীবন যাত্রা।

কোনও ঝড় বাদলের রাতে
নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়
কোন ভিখারি তার সন্তানকে
নোংরা ফুটপাতে আঁকড়ে থাকার প্রয়াস।

এখানেই তো আমার মনের
তৃপ্তি কে খুজে পেয়েছি,
ওদের নিঃসার্থ ভালবাসায়।

মনের সুসজ্জিত কক্ষ
বহুদিন যাবৎ শূন্য হয়ে আছে,
তাই আজ রাখবো সেখানে
শান্ত, স্নিগ্ধা ও অপরূপা
আমার প্রেমিকা তৃপ্তিকে।

২রা অকটোবর এবং তারপর

চিত্ত মাহাতো

চলে যাওয়া আর পাঁচবারের মতো পেরিয়ে গেল ২রা অক্টোবর।
এবারও ফাঁকা মাঠে জড়ো হল হাজার হাজার মানুষ।

কাঠ রোদে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটার ফুলে ফুলে ভরে দিল গা
নত হয়ে নিবেদন করলো অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নতি,
দীর্ঘায়িত হয়ে চলল অহিংসার পূজারীর জীবনালোচনা।

তারপর সবাই হিংসা ত্যাগের অঙ্গীকার করলো সমস্বরে।
ঐ দিন যারা আশ্বাস দিল অহিংসার
ইতিমধ্যে তারা হল বিভীষনের মতো।

এখন নিথর মরুভূমি জীবনগুলোর জন্য
আর এগিয়ে আসছেনা দু-একটাও জলপাত্র হাত।

খুন কান্না মৃত্যুর সংবাদ নিয়তই
ছিটকে আসছে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়।

কত সস্তায় হারিয়ে যাচ্ছে ফুটপাতের নিঃস্বহায় জীবনগুলোর মতো
আমামাদের বিবেক-বুদ্ধি। আজ কাল পরশু তারপর···তারপর

শতাব্দী

দীপঙ্কর নন্দী

শতাব্দীর পরেও আমি অপেক্ষা করে আছি
তোমার সুঘ্রাণ বুকে করে,
আমি সুস্পষ্ট ঝর্ণাধারায়
উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বাতাস তাড়িয়ে বেড়াই—
দীর্ঘশ্রান্ত আকুল চিন্তায়
বাড়ন্ত শিমূলফুলে হঠাৎ থেমে যাই—
অবর্ণনীয় এক যৌতুক আনন্দ
আপনমনে হেসে উঠি—
ব্যাকুল হয়ে উঠি আত্মনির্ভর
চেতনাগুলোর তাড়নায়—

ছুটে বেড়াই
শব্দে—বাষ্পে আর—গন্ধে
কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবে খুঁজে বেড়াই
একটি নিঃসংশয় বর্তমান,

আর তখনই
শৃঙ্খল জরুরী হয়ে ওঠে,
আমি অধিকতর জীবনের দিকে
এগিয়ে যাই।

আলেয়ার মত তুমি

মীনা ভট্টাচার্য

আলেয়ার মত তুমি—নিশীথ গভীর হলে,
আমার হৃদয় সমুদ্র হতে—
সবগুলি হীরক খণ্ড—নিয়ে গেছ ভুলে।

উচ্ছল তরঙ্গ জীবনের আহ্বানে,
বালুকারাশির মাঝে একান্ত মনে
শুধুই খুঁজিয়া মরে গো ই তোমারে।

হে মানসী,
নিঃস্তব্ধ প্রহরে—পাছে—কাছে যাই বলে,
থাকিলে বসি—বেদনাহতের মত
রাতের গভীরে দিপ জ্বেলে
নীরবে আঁখি মেলে।

পাই নাই যাহারে তাহারি লাগি,
অজস্র অশ্রু বিন্দু পরিছে ঝরি—
মর্ম বেদনায় ভরা ব্যর্থ হাহাকারে।

দেবতার দুটি পায়ে

শরজিত মুখোপাধ্যায়

আমি জানাই প্রনাম মোর দেবতার দুটি পায়ে।
জানিনা কোথায় দেবতা কোন সে দেবালয়ে।
ঝরে যবে দেবতার লাগি অশ্রু বারিধার।
প্রাণ কহে প্রানেশ্বরে দিই সপিয়া আপনার।
খুলিয়া মন্দির দুয়ার হস্তে লয়ে পূজা উপাচার।
একদা প্রবেশিল পূজারি এক মন্দিরে দেবতার।
জ্বলিয়া ধূপ, দীপ, বেদী তলে রাখি গঙ্গাজলে।
কুসুমে সাজাইয়া ডালি মন্ত্র উচ্চারণে বলে।
রাখিলনা সাজাইয়া আপন হৃদয় কুসুম ডালি।
নাহি ছিল মোর প্রভুর চরণে আপন হৃদয় ঢালি।
শুধু দাও, দাও, বলে চরণে জানাইল অঞ্জলি।
দিতে সন্তানেরে দেবতার অশ্রু বারি ঝরে।
শূন্য হৃদয় তাহার প্রবেশিতে পূন্য মানেহার।
বৃথা আয়োজন হইল তাহার বৃথা পূজা উপাচার।

শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল

চাঁদ উঠে নীলাকাশে, ফুল ফোটে বনে,
পাখি গায়, অলি ধায় মধু আহরনে।

ফুল থেকে ফল হয়, ফল থেকে গাছ,
চারাপোনা বড় হয়ে জলে থাকে মাছ।[1]

পূব দিকে উঠে রবি, ডুবিছে পশ্চিমে,
দিনে দিনে আয়ু ক্ষয় কেউ নেই থেমে।

গিরি হতে নদী বয় মোহানার পানে,
শাশ্বত প্রকৃতি কথা বলে কানে কানে।

এরি মাঝে জীবকুল বাঁচে আর বাড়ে,
প্রতিকূল পরিবেশে লড়ালড়ি করে।

নরগন মিথ্যাচারী স্বার্থের কারণে,
তবু সদা সত্যজয়ী জানে মনে প্রাণে

বিবেকের কশাঘাতে মনুষ্যত্ব জাগে,
সবারে বাসিতে ভালো প্রেম অনুরাগে।.

অন্ধকারে ডুবে আছে পথ সব

প্রত্যূষ পড়ুয়া

অন্ধকারে ডুবে আছে পথ সব চারিদিকে নিবিড় কুয়াশা
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে বেদনায় বিদীর্ণ হয় রাতের আকাশ
ঠিকানা হারিয়ে যায় নিশানায় লক্ষ্যভ্রষ্ট সব পথ দূর্গম অপার
বন্ধুর জীবনে আজ শীতের বরফঝরা, কণ্ঠ ঘিরে কঠিনতর ফাঁস।
মেঘের ভিতরে পথ , পাহাড়ের কঠিন গায়ে শত শত চড়াই উৎরাই
হৃদয় স্পন্দন খুঁজে তুষার ঝঞ্ঝার পথে যাত্রা তবু করিব বারংবার
বন্দরে বন্দরে ভীড়, অবরোধ, বারুদের গন্ধে পূর্ণ রাতের আকাশ
কি দূর্বার বাঁচার স্বপ্ন ! অন্ধকার, চারিদিকে ঘন অন্ধকার ।
ডুবে আছে সব পথ অন্ধকারে, ভোরের আকাশ কতদূর
প্রতীক্ষায় ক্লান্ত সব, প্রত্যাশার স্বপ্ন শুধু একটুকু সোনালি রোদ্দুর।

যদি, তা না হলে

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

জন্ম ?
না ত !
জন্ম নিতে আমার
মোটেই আপত্তি নেই ।

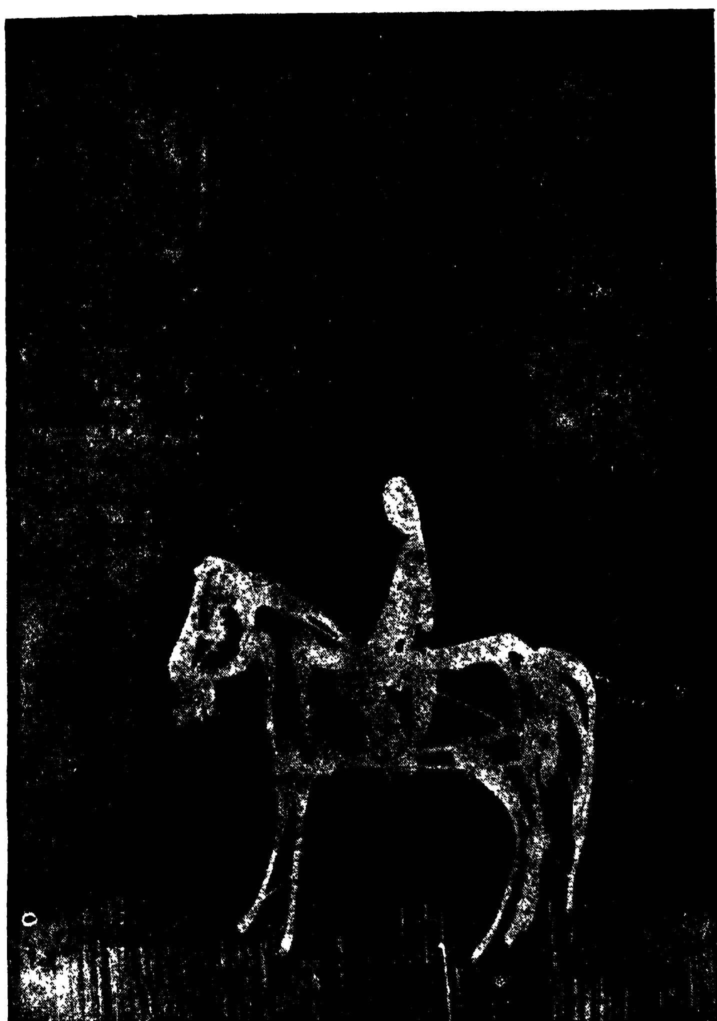
তবে
হ্যাঁ,—
আধি কিংবা ব্যাধি,
জরায় আপত্তি আছে—
ভীষণ আপত্তি ।

আর,
মৃত্যু হোক
তাও আমি চাই না,
মোটেই তা চাই না ।

অতএব—
শোনো,
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন
জন্ম যদি থাকে,
তবে বল ;

আমি বার বার,
শতবার, শতশত বার—
পুনঃ পুনঃ
পুনর্জন্ম নিতে পারি।

তা না হলে
চাই না ;—
মৃত্যুময় জন্ম নিতে
কখনও আর চাই না।





দাউদাউ

আলোক সরকার

একটা কাহিনী এখানে শেষ হয়েছে। পথ দিয়ে যেতে যেতে
ঘাড় উঁচু ক'রে তাকাই। আর অমনি স্তব্ধতা
মৃত্যু যে রকম স্তব্ধ ঠিক সেইরকম স্তব্ধতা

সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই উপরে জ্বালিয়ে নিই মোমবাতি
একটা ঘর শেষ হয় তারপর অন্য ঘর—
একটা কাহিনী এখানে শেষ হয়েছে স্মৃতিচিহ্ন কোনখানে নেই।

কেবল একটা স্তব্ধতা মৃত্যু যে রকম স্তব্ধ।
বর্ষায় ভিজে উঠেছে জুঁই কার্নিশের অশ্বত্থচারা
মোমবাতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি কুয়োতলার শ্যাওলার সবুজ।
একটা ঘর শেষ হয় তারপর অন্য ঘর

মোমবাতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি
স্তব্ধতা জ্বলে উঠেছে দাউদাউ মুখ-থুবড়ানো পা-ভাঙ্গা টেবিল—
একটা কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে।

তামাশা

আনন্দ বাগচী

চতুর্দিকে যেন মধুক্ষরা সুবাতাস আর
অনাহত শান্তির কল্যাণ
আজ আমার মুখাপেক্ষী দাসানুদাসের মত বসে আছে স্থির,

জন্মান্তর রাশিচক্রে অনিশ্চিত গল্পের খসড়া
সামান্য ইসারা পেলে বর্তে যাবে, মুখের কথায় বদলে যাবে !
কেন এই প্রহসনে, কেন এই বিশুদ্ধ অনাশা
প্রেমিকার মত কোন রুদ্ধশ্বাস বন্দুকের নল··

আপনার চায়ের কাপে কচামচ ? যেন সুখ এমনি ভাবে মাপা,
যেন বলে দেওয়া যায় কী চায় আমার মন, কতটুকু চায়,
নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা আছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ,
দম্পতির সুখ যেন আয়নার মধ্যে ভাসা মুখ

খুটিয়ে খুটিয়ে দেখা, খুঁজে নেওয়া, অতি পরিচিত রূপরেখা
স্ত্রীর কাছে স্বামী যা যা পেতে চায়, জীবনসঙ্গীর কাছে নারী ।
আজন্ম রক্তের মধ্যে যেন এই খেলাধুলো
অভ্যাসে অভ্যাসে ছকা আছে

প্রেমেন নির্ভুল খসড়া বার্ধক্যের দিকে যেতে যেতে
নিখাদ নিশ্ছিদ্র থাকে সেই পুরাতন গৃহস্থলি
কর্তব্যকরণ শেষে শব্দহীন শীতের রাত্তির
কোলের শিশুও দ্রুত হাত ছাপিয়ে উল্টো মুখে হাঁটে,
উদ্যত চামচ শূন্যে থেমে থাকে ; ক চামচ চিনি ।

কাঁটার আসনে আছে বিষের ভাণ্ডার

বিশ্বজিৎ তপাদার

ভুলে গিয়ে পথের ঠিকানা চাঁদও আজ বিদায় নিয়েছে
কতরাত একমনে বসে থেকে যেতে ভালো লাগে ?
তবু আজ বিদায় নিতেই হোল ভাপোবাসা নেই
চারিদিকে শুধু ওঠে ক্রমাগত প্রতিধ্বনি
ভালোবাসা নেই, স্নেহমায়া নেই, প্রেমপ্রীতি নেই।

কেন নেই ? উত্তর কে দেবে মালবিকা ?
সেই তুমি কবে থেকে বসে আছ একাকী বনের ধারে
উত্তর পাবার বাসনা ? বৃথা জেনে রাখো
যে পথেই মানুষ গিয়েছে পায়ে পায়ে
কাঁটার অস্তিত্ব ছিল ; তবু তার অগ্রগতি
অনড় অচল। কিন্তু আজ ?

কাঁটার আসনে আছে বিষের ভাণ্ডার।
যে পেয়েছে অমৃতের স্বাদ গরল বিষ ভালো লাগে ?
তাই আজ বুকভাঙ্গা, অভিমান নিয়ে
ক্রমাগত পথভুলে চাঁদ এঠিক বিদায় নিয়েছে।

ভালোবাসা দিতে পারি

বিনয় মজুমদার

ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহনে সক্ষম
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝরে যায়—
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি, অবশিষ্ট কিছুই থাকে না

এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়
কখনো ওড়ে না ; তবু ভালোবাসা দিতে পারি আমি

শাশ্বত সহজতম এই দান—শুধু অঙ্কুরের
উদ্গমে বাধা না দেওয়া, নিষ্পেষিত অনালোকে রেখে
ফ্যাকাশে হলুদবর্ণ না করে শ্যামল হতে দেওয়া ;

এতই সহজ, তবু বেদনায় নিজে হাতে রাখি
মৃত্যুর প্রস্তর, যাতে কাউকে না ভালোবেসে ফেলি।

গ্রহণে সক্ষম নও। পারাবত, বৃক্ষচূড়া থেকে
পতন হলেও তুমি আঘাত পাও না, উড়ে যাবে ;

প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি
চলে যাবে ; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রনায় স্তব্ধ হব আমি।

তবুও আকাশ পদ্ম

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

কালরাতে ঝড় হয়ে গেছে
প্রত্যাশিত ছিল না বলেই
এমন উন্মূল করে দিয়ে অনুভবগুলি
বিশ্বাসের শক্তগাছও ঝুরিশুদ্ধ উপড়ে পড়েছে।

গতদিন বিষের ছোবল তুলে
কাল নাগিনীর মতো বুঝি বন্যার তাণ্ডব
ছদ্ম সুয়োরাণী সেজে অলক্ষ্মী এনেছে,
জীবনকেও করেছে বিবর্ণ।

সদ্য এক চারাগাছ মাথা তোলে,
পাথর সরিয়ে তার ফ্যাকাশে পাতায়
সূর্য-শ্বেতসার চায়, তবু—
না, পাথর নয়, মাথার ওপরে তার
উন্মুক্ত আকাশ, নীল নয়, আশায় সবুজ!

যুদ্ধের দৌলতে যদি হাজার শকুন উড়ে,
তবু কোন্ নীল হ্রদে পদ্ম ফোটে;
কোলা ব্যাঙ খবর জানেনা তার,—
দূর থেকে দ্বিরেফের আগমন ঘটে।

মহীরুহ

তপন গোস্বামী

একটা গাছ মহীরুহ হলে, দুটো গাছ তারই তলায় দু-পুরুষ কাটিয়ে যেতে পারে। মানুষেরাও কাঁথাকানি শুকিয়ে নেয় তার ডালে, তারই কাঠে ভাত রান্না করে, এমন কি গভীর পাপ—তারও স্বীকারোক্তি থাকে অশ্বথের ডালে।

ঐ গাছ মানুষের পূজো নেয়, সমস্ত বৈশাখ মাস ঘটি ঘটি জল খায় মানুষের হাতে। এবং অসময়ে সেও পুড়ে যেতে পারে মানুষের শোকে।

এ বিশাল তেপান্তরের মাঠে আমাদের কোন মহীরুহ নেই। এখন মানুষের মাপ এত ছোট ছোট যে তার ছায়ায় একদণ্ড বিশ্রাম চলে না। বস্তুত পূজারী অনেক, একজনও পূজনীয় নেই।

দিনযাপনের কবিতা

তুলসী মুখোপাধ্যায়

মলিন মমির মতো পড়ে আছে বিশীর্ণ যৌবন
দুএকটা চিত্রকর মাছি ইতস্তত ওড়াউড়ি করে
খুব নিচু চেয়ারে বসে

ঘাড় গুঁজে কেটে গেছে কুড়িটা বছর
আরো বছর পনেরো নির্ঘাৎ
কেটে যাবে একই চেয়ারে

অর্থাৎ

করাতের দাঁতের মতো আরো হাজার দশেক সেলাম
খুব উঁচু করে ছুড়ে দিতে হবে উপরতলায়।

একেকদিন দূর কোনো গ্রহলোক থেকে
প্রসিদ্ধ চরণে

ছুটে আসের দুরন্ত আহ্বান
সে ভাষা বুঝি না—

সে কি ফাঁসির আদেশ? না কি মুক্তির আকৃতি?
বুঝি না বুঝি না!

নিদারুণ জ্বরের ঘোরে ছটফট করি
আর মনে মনে বলি—
হে ঈশ্বর

হাতে তুলে দাও এক নম্বর লটারী
এবং একটি গোপন কিশোরী
আমি ার কখনো কিছু বুঝতে যাবো না

বিবাহের দিন

শিবশম্ভু পাল

যে কোনো বিয়ের দিন কলকাতায় বাস কমে যায়
কাটাপোনা তিরিশ টাকায়,
বিবাহবিহীন লোক রেগে যায় খুব···

ওদিকে শাখের শব্দ, বেনারসী, শান্তিপুরী ধুতি
সুকল্যাণী আগামীর কিছু প্রতিশ্রুতি
রূপের আড়াল তুলে প্রকৃত স্বরূপ

দেখে নেওয়া, মানুষের সঙ্গে মানুষীর
শুভযোগে সহযোগে চতুর্দিকে আলোকিত খুশি ;
আমাদের মুখগুলি ম্লান।

আমাদের বাড়িফেরা, কাজকর্ম আছে
আমরাতো ইতিমধ্যে স্বরূপ দেখেছি ঢের, কোনক্রমে বাঁচে
রুগণ প্রতিবন্ধী বর্তমান।

বিবাহের দিন হলে বড় ভয়, বড় রাগ বিবাহহীনের
বিবাহের দিন শুধু নতুনের, শুধু নতুনের
বিবাহের দিন শুধু প্রতিতুলনীর

রজনীগন্ধার সঙ্গে এটো কলাপাতার জঞ্জাল
রিজার্ভ বাসের সঙ্গে বাসস্টপে প্রতীক্ষার কাল
কখনোই সমান হোলনা।

গোপাকে

কেদার ভাদুড়ী

জানো গোপা, মানুষের কথা লিখতে হ'লে বাঁদরের কথা লিখতে হয় বেশী।
রাক্ষসের কথা লিখতে হয় আরো বেশি ক'রে। দত্যি

দানো ভূত প্রেত পিশাচ পিশাচী, সত্যি
তাদেরো তো কথা থাকে, গল্প থাকে দেশী বা বিদেশী

আসলে, যেসব মানুষের শস্যখেত নেই, সময়কে ভাগ ক'রে একভাগে একক
তমসা জানো গোপা।

পৃথিবীতে কত রক্তপাত হলো? অ'জতক? দুঃখ কষ্ট ব্যাধি মৃত্যু কত হল?
অপমান? কত হলো? আজতক? মানুষের অনর্থক বস্তুত নিরোপায়!

কার কী

অরুণ বাগচী

তারপর যতই হায় হায় করুক পাতারা
ফুলটার কী আর আসে যায়
অবাঞ্ছিত বুদ্বুদ সে তো ঝরে এলো
শালিকের হিংস্রক ঠোঁটে আলোর চূড়ো থেকে
পড়তে পড়তে জেনে গেছে হাওয়ার শতেক চাতুরি
কার রোদ্দুর কার বৃষ্টি ভ্রমর কেন আসে যায়
প্রজাপতির পাখায় হলুদ হতে হতে
টুপ করে সে ডুবে গেল ঘাসের ভিড়ে

তারপর যত ঢেউ উঠুক জলে কার কী
শেওলার সব সুঘ্রাণ এড়িয়ে এড়িয়ে
মাছটা পৌঁছল হিম হিম কাদায়
তাকে সঙ্গ দিতে এলো দুটো চারটে বুদ্বুদ
অনেক উপরে ভাসছে পদ্মফুল গোল গোল পাতা
দিনের দক্ষিণা সবুজ সাজিয়ে রেখেছে দিঘিটা
রাত্রে তারা মিটমিট চাঁদ জাগলে রূপোর আলপনা
তাতে অন্ধ মাছটার কী তখন আর কী

হঠাৎ পাওয়া পৃথিবী থেকে
আকাশ থেকে গাছ থেকে
জলের অগাধ আশ্রয় থেকে
ঝরে গেলে কার কী
তখন আর কার কী।

শুনলাম

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

শুনলাম আমাকে নিয়ে আপনাদের দাম্পত্যকলহ
হচ্ছে আজকাল
সে কি?

শুনে লজ্জা করে, একটু আনন্দও হয়।
দশ-বারো বছর, নাকি তারও বেশি
পনেরো বছর আগে
আমাদের পত্রালোপ ছিল,
কথাবার্তা হোত, ঘনিষ্ঠতা,
ভাবা গিয়েছিল
ভাসতে-ভাসতে দুজনেই কোনো একটা
গ্রাম পেয়ে যাবো।

তা যখন ঘটলো না বরং
ইচ্ছা ও নিরাশা পুনর্বিন্যস্ত করেই
কেটে যাচ্ছে দিন,
কমে যাচ্ছে আয়ু—এ সময়
হঠাৎ গরিবকে নিয়ে আপনাদের দাম্পত্যকলহ
এতকাল পরে কি মানায়?

নগণ্য ছিলাম, থাকি, কেন আর
আপনাদের শতরঞ্জ খেলার কার্তুজ।

তোমার পন্থা

শ্যামলকান্তি দাশ

তোমার পন্থা নগন্ন আর হলুদ !
আমি চাইছি আরেকটু ঝরঝরে হয়ে
বসুক না সে অন্য কোনোখানে,

আলতো একটু গানের মতো
নিচেউফটিক জলের মতো
ঘরে আসুক, আসুক না ওই
আবোলতাবোল বিপিন ছেড়ে ঘরে—
কথা বলুক ফিনফিসিয়ে অলেখা অক্ষরে !

যে-ফুলে আজ অফুল মেঘ কাঁপে
কাঁপে নবীন স্পর্শকাতরতা
যে-ভাষা আজ ছড়াতে চায় সমাজবন্ধনে—
তোমার পন্থা সেখানে পড়ে ঝুঁকে
সেখানে দলছাড়া !

আমি চাইছি উন্নাসিকের মরণ !
ওই মরণে বসুক না সে স্বাধীন
একটি ঘন-স্বাধীন মাছরাঙা,
সকাল বিকেল পাল্টে ফেলুক বর্ণ !

হঠাৎ ছায়ার মতো

কার্তিক মোদক

বড় একা হয়ে আছি, চতুর্দ্দিকে বাঁশী বাজে নিঃসর্গ রোদে
ঝর্ণার শব্দে তোমার
দরজা খুলে যায় উপত্যকা ঘিরে পাহাড়ী মেঘে
সমতলে নেমে হিম ঝুরি
বৃষ্টি ফোটা ছন্দে ভোরের শিশিরে পথ চলে
হঠাৎ ছায়ার মতো
তুমি এসে দাঁড়াও ক্যালেণ্ডারের পাতায় গাছপালা ঘিরে
আমরা বসে আছি লজ্জিত হয়ে অস্পষ্ট কুয়াশা পটে

ব্যাধি

গোপাল ভৌমিক

কথার খেলাপ হলে
অথবা এ ছানি পড়া চোখে
যদি ধরা পড়ে কোন ক্রটি ও বিচ্যুতি
ইদানীং বড় চটে উঠি।
অথচ সৃষ্টির বীজে
ঘুণ-পোকা রয়েছে লুকায়ে
বুঝে এই সার সত্য
এতদিন সব কিছু মানিয়ে চলেছি।

ইদানীং ক্ষমা টমা
সব কিছু শেখা বুলি বেমালুম ভুলে
ক্রোধের কুড়াল হাতে
যাকে পাই তাকে তাড়াকরি।
খাস তালুকের প্রজা নয় বলে কেউ
সকলেই ক্ষেপে উঠে
স্বভাষায় তিরস্কারে কসুর করে না
বোধির ব্যাধিতে আমি ভুগি।

ভুল

মৃণালকান্তি দাশ

পথের দু'পাশে ছড়ানো রয়েছে ভুল
সে-ভুল মাড়িয়ে কী করে তুলব ফুল
ফুল তোলা আজ কতখানি সঙ্গত
ফুলে ফুলে শুধু জেগে আছে ভুল ক্ষত

ফুল ফুটে আছে ছড়ানো ভুলের মতো
সে-ভুল কোথাও হয়েছে কি প্রতিহত
ভুলের পিছনে সাজানো রয়েছে ফুল
কেন ফুল ফেলে দু'হাতে জড়াব ভুল

পাতা উল্‌টে গেল

অরুণ মিত্র

পাতা উল্‌টে গেল
ওপাশে কোথাও তোমার মুখ
আর এপাশে আমি একগাদা অক্ষর নিয়ে ব'সে আছি।

তোমার গল্পের কিছুই এখানে নেই
না শিশির না বৃষ্টি,
চোখের জলও নেই,
কালো আঁচড়গুলো ভীষণ শুকিয়ে উঠেছে
আগুনকে ডাকছে।

দিনলিপির একদিন

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রক্তে খুব চিনি আছে ?   নেই।
ইউরিন, স্টুল ?   স্বাভাবিক।

এক্স রে হল।   ফুসফুসে গণ্ডগোল নেই।
রক্ত চাপ ঠিক আছে।

তাহলে কোথায় গণ্ডগোল ?   কোন অন্ধকার থেকে
উঠে আসে ব্যথা ও বেদনা ?

ডাক্তার জানে না।   রোগীনীও হতবাক।
রোগীনীর বুকে ব্যথা হয়।

নষ্ট করছেন

তারাপদ রায়

বিপদের কথা আর বলবেন না।
সাতদিন কলে একবিন্দু জল নেই
শুকনো মুখে, অস্নাত, তৃষ্ণাৎ, ফ্যাফ্যা,
অথচ পাশের বাড়ির উঠোনে
সকাল থেকে নিখিলবাবুর বাবাকে দেখছি
বালতির পর বলাতি জল মাথায় ঢেলে
টইটম্বুর স্নান করছেন

এই দুর্দিনে নিখিলবাবুর কোথায় যে
এত জল পাচ্ছেন কি করে
কিন্তু আমাদের তো এই সাতদিনে
বাপবাপ ডাক উঠে গেছে,

আমরা জেনে গেছি জলই জীবন
আমরা জলের স্বপ্ন দেখি
আমরা জলের চিন্তা করি
অথচ নিখিলবাবুর বাবার কিছুই তোয়াক্কা নেই
বালতি বালতি জল মাথায় ঢেলে
নষ্ট করছেন।

প্রিয়তম ডাক

রতনতনু ঘাটী

আমি তার গান মঞ্জরীর দিকে যাবো
দুহাতে আমি তার হরিৎ ছিঁড়ে খাবো
হারাবো না তাকে ।

খিন্ন গরিমা দিয়ে
চাঁদের মাটিতে তার কঙ্কাল হারাবো
জীবনের ফাঁকে !

আমি তার স্বপ্নের দুদিকে একা যাবো
তাকে আমি মন্দিরের চূড়ায় জড়াবো
হারাবো না তাকে ।

ছিন্ন কবিতা দিয়ে
দুহাতে আমি তার জীবন ভরাবো
প্রিয়তম ডাকে !

অমিতাভর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তা

পূর্ণেন্দু পত্রী

এবছর-ও বছর মিলিয়ে
অনেক কিছুই দেখা হয়ে গেল আমাদের।

বলতে গেলে অনেক কিছুর এপিঠ ওপিঠ দুইই।
যেমন জামার সামনের দিকে চেকনাই
আবার উল্টোপিঠের নাড়ি-ভুঁড়ি।

যেমন বাঘের বাচ্চার মতো সম্পাদকীয়
আর তার পিছনে শিয়াল—শকুনের
তেরচা হাসির মস্করা।

যেমন দরজার বাইরে সেনমশায়ের ধুতরো-হাসি
আর দরজার ভিতরে টেলিফোনে-ট্রাঙ্ককলে
গাল-ভর্তি কূট-কপালির কুলকুচি।

হার না জিত ?

হেড না টেল ?

তুই কয়লা—এঞ্জিনের কুচকুচে ধোঁয়ার
পলেস্তারা ফাটিয়ে বললি,
—আমি সেই সবের দিকে
যা শেষ পর্যন্ত আরোগ্যের আলো।

মরা নদীতে ডুবে-যাওয়া নৌকোর ভাঙা হাড়-গোড়ে
সেঁক-তাপ দিতে দিতে আমি চেঁচিয়ে বললাম,
—আমি সেই সবের দিকে
যা শেষ পর্যন্ত সমুদ্রস্নানের মতো ভালোবাসা।

তারপর
আকাশ থেকে পেড়ে
আগুনের উজ্জ্বল গ্রহটাকে বুড়ো আঙুলের ডগায় নিয়ে
টকাং।

তোর মনে আছে নিশ্চয়।

আর সেই বছরই ঝমঝমিয়ে রক্তবৃষ্টি।

এ-বছর ও-বছর মিলিয়ে
অনেক কিছুই দেখা হয়ে গেল আমাদের
বলতে গেলে পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ দুইই।

ভ্রমণ কাহিনী

সুরজিৎ ঘোষ

ভ্রমণের পর ফিরে এসে
আমার বলার মতো থাকে না কিছুই
সারাদিন ধরে শুধু ধুলো ঝেড়ে
ঘর বাড়ি আগের মতোন করে তুলি।

পথের গল্পগুলো চুপচাপ পড়ে থাকে
তোরঙ্গের নিচে।

একবারই শিশির ঝরে একজন্মে মাত্র একবার

কবিরুল ইসলাম -

একজন্মে একবারই সম্ভব শুধু
একজন্মে মাত্র একবার
বাকি সব আধময়লা ঢিলে পায়জামার মতো
বিবর্ণ অভ্যাসমালা।

চুম্বন চুম্বন নয়, আলিঙ্গন আলিঙ্গন নয়।
একবারই শিশির ঝরে একজন্মে মাত্র একবার।।

ঝুলে পড়ি

মলয় সিংহ

তোমাকে চিনেছি আগে, জানি তুমি চতুর
স্বভাবে প্রচ্ছন্ন ছিলে, মানুষ ঠকানো কাজ।

তুমি বুঝেছিলে মানুষ একমাত্র হিসেবী
তেকাঠি ফাঁসের আড়া তাই তার চৌকাঠে রেখেছো।

সে ঝুলে পড়ে অনায়াস—ভঙ্গিমা বেদনায়
তার স্মৃতিভূমি বিচ্ছিন্ন, রোদে পোড়ে তার মুখ।

আমি ঝুলে পড়ি।

ভুলে যাও ভুলে যাওয়া ভালো

সুনীল কুমার নন্দী

ওদিকে কোথায় কারা
দাঁড় বায়, ছপ্ ছপ্, বুকে প্রতিধ্বনি ভাঙে—
দূর
বাইখেলায় বাহু পায়না দাঁড়ের তেজ
ধু-ধু
জলের কটাক্ষে কাঁপে সমস্ত শরীর, নৌকো
হিমে
অসাড় ময়াল যেন শুয়ে আছে ঘাটের ছায়ায় ;
তাহলে বাইচে ভাসা ভুলে যাও, ভুলে যাওয়া ভালো।

বসন্তকাল

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে চড়াই
আর একটা কাঠবিড়ালী
সারাদিন ঠোঁট ঘষে চলে আয়নায়।

নিজের জন্য কষ্ট হয়,
বাদামপাহাড়ের ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে
আছে অনেকক্ষণ, ধূসর পাহাড়—

সেও আজ হাতছানি দিয়ে ডাকতে ভুলে গেছে
এই আয়নার প্রহরীকে।

এখন বকুল

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

বকুলতলায় এলেই আত্মহারা অন্তর্জগৎ,
একমনে কুড়োতে থাকি কুড়োতে থাকি কুড়োতেই থাকি,
সময়ের সীমা হারিয়ে যায়
কাজেরো।

বকুলতলায় এলেই থমকে দাঁড়াই,
দুদশটা তাড়াতাড়ি তুলে নেই—আর
ঘড়ির দিকে তাকাই :
দুদিকের টানে দিশাহারা।

এখন বকুল মাড়িয়েই চলতে হয়।
বকুল ছড়ানো যখন পথেরি উপর
ছুটে-চলা জুতোর তলায় সব দ্বিধা
চ্যাপটা হয়ে যায়।

উদ্ভট চউপই

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দু বেলা দু বার
রঙচটা ট্রাউজার ঘিরে পড়েছে চার দেয়াল। গেলাসের
জলে কন্‌কন্‌ করে বেজে ওঠে নিজের না-মুখ,
বিয়ানি-চামরে চুলে পড়ে।

সুখ এত সুখ
বাঁধছ আমায় বসে উদ্ভট চউপই।
অন্ধকার ডুব দিয়ে উঠে আসি গলার মুক্তোর কারুকাজে।

পথ ঘুরে উড়ে আসে শিস…
দুয়োরে কুলুপ দিয়ে কে জানে কোথায় চলে গেছে দিন—
হাড় মেদ বসারক্ত কায়ার নির্যাস হয়ে বসে আছি—

অক্ষর চউপই
দোর জোড়া যক্ষী হয়ে ভেসে ওঠে, কৌতুক পাথর
বুকে গলে গলে পড়ে ভেসে যায় ঘর
চার দেয়ালের নিচে।

রঙচটা ট্রাউজারে
সোনার রূপোর কারুকলা।
আরশি নেই বলে মুখ দেখতে পাই না।

নগ্নতার চেয়ে

শান্তনু দাস

তুমি জল দাওনিকো ভোরে
কেন ?

ঘুমের শরীরে তুমি জীবনের মানে খুঁজেছিলে ?
এত দেরী   তাই ?

দেখছো উঠোনে—

অন্ধকার খুঁটে খুঁটে কাক ছাখো রোদ্দুর ভিজিয়ে
দিন আনে—খড়ের চালায়।

শুখনো দাওয়ায় তুমি একটুকু বোসো
একটুকু।

হাইতোলা ঘুমের শরীর বড়ো ভালো লাগে
নগ্নতার চেয়ে।

অনিদ্রা

রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়

এখনো বোজেনি চোখ, বুজলেই রাত্রি হবে
নিশির ডাকে
স্বপ্ন আসবে ছুটে, একদিন মিথ্যা সুখের !

জীবনের চেয়ে মৃত্যুর ইশারা দেখলে তুমি পিপাসার্ত হবে
সেই দিন
রেড রোড ফেলে বাছতে বাছতে চলে যাবে এঁদো গলি
আঁচলে লাগবে, রোমকূপে, স্ফীত ঠোঁটে এতো লালা
কোথা দিয়ে ঝরে !

সেদিন বুঝবে পেটের গভীরে কত খিদে, মুঠো করে
পুরে দেবে ভাত।
যথাযথ বইছিলো পৃথিবীতে সুখের বাতাস, দামী প্রসাধন
তবু একদিন

একটি দুঃখের জন্য কিংবা ততোধিক কষ্টের জন্য
নিরাপদ পিঠ পেতে দেবে, খুঁজে খুঁজে বুকের মাধ্যমা
তুমি একাকি তোলপাড় করে জল যতই সাগরে নামো
যেদিন কুড়িয়ে নেবে একটি ঝিনুক কিংবা একমুঠো বালি
সেদিন কিছুতেই দুঃখ আর স্বজন নয়।

যেদিন সামান্য একটি স্বপ্নের কাছে হেরে যাবে তুমি
সেদিন দেখবে কিছুতেই মাথা বালিশে রাখতে পারছো না
সেদিন সত্যিই, দুঃখ কাকে বলে তুমি জেনে ফেলেছো।

আকাশ চেরা বিদ্যুতের মত

হুসাইন মহম্মদ এরশাদ

আমরা মৃত
না কিছুতেই নয়।
তবে কেন আমরা প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি ?
আকাশ ভাঙ্গা বজ্র কেন পড়ে ?
হৃদয় জুড়ে কান্না কেন জাগে ?

এসো, ভৈরবের রাগিণীর মত
সরোদ সানাইয়ের যুগল বন্দীতে
ছন্দিত হোক দেশের কলতান
প্রজ্জ্বলিত বারুদের মত
ভরা বাদলে বৃষ্টিধারা ঝরে ক্রমাগত
আমার হৃদয়ে, তবু জ্বলে অগ্নিশিখা

রাত্রির অন্ধকারে
হারিয়ে যায় ভালবাসার গান
বিরহের বিষণ্ণ রাগিণী
এসো অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠো—
প্রদীপের মত নয়, বারুদের মত
আকাশ চেরা বিদ্যুতের মত।

আমরা মৃত নই।
আমরা অগ্নির সন্তান।

না বাউল, সংসারীও নয়

আহসান হাবীব

না বাউল, সংসারীও নয়।
কতিপয় মানুষের বাস এইখানে
খুঁটিহীন চালহীন আবাসে নিবাস
তারা না বাউল, সংসারীও নয়।

তাদের চারদিকে
সংসার সংসার খেলা ছড়ানো ছিটানো, তারা সংসার করে না
বাউলের বনশ্রী দেখেনি তারা ঈশ্বরের গাঢ় কণ্ঠস্বর তারা শোনে না কখনো।
আলো নয় অন্ধকার নয় অন্ধকারে আলোর উৎসব নয়
না বাউল, সংসারীও নয়। একতারা রাখে না, হাতে
ফুল কিংবা ফসলের ঝুড়ি দেখিনা তাদের হাতে
না বাউল, সংসারীও নয়। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন ভোজন কিংবা
নৈশ ভোজে দেখিনা কখনো অথচ ক্ষুধার কথা বলে
তৃষ্ণার কথাও পথে হাঁটে সংসারের দিকে থাকে চোখ
পথের বাউল নয় দিনরাত পথেই কাটায়।
ভালোবাসা আছে, তবু ভালোবাসতে দেখিনা কখনো।
পথের বাউল নয় সংসারীও নয় ঈশ্বরের নয় তারা মানুষেরও নয়।

রঞ্জিতাকে মনে রেখে

শামসুর রাহমান

রঞ্জিতা, তোমার নাম এতকাল পরেও কেমন
নির্ভুল মসৃণ মনে পড়ে যায় বেলা অবেলায়
রঞ্জিতা তোমাব সংগে দেখা হয়েছিল কোনো এক
গ্রীষ্মের দুপুরে দীপ্র কবি সম্মেলনে
কলকাতায় ন' বছর আগে, মনে পড়ে ?
সহজ সৌন্দর্যে তুমি এসে বসলে আমার পাশে

কবি প্রসিদ্ধির
অমেয় ভাণ্ডার থেকে রত্নরাজি নিয়ে
আজ আর সাজাবোনা তোমাকে রঞ্জিতা। শুধু বলি,
তোমার চোখের মতো অমন সুন্দর চোখ কখনো দেখিনি।

'বিচ্ছিরি গরম'
বলেই সুনীল খাতা দুলিয়ে আমাকে তুমি হাওয়া
দিতে শুরু করেছিলে, সেই হাওয়া একরাশ নক্ষত্রের মতো
মমতা ছড়িয়ে ছায়। যদি আমি রামেন্দ্রসুন্দর
ত্রিবেদী হতাম, তবে বলতাম হে মেয়ে 'ইহাই বাঙালীত্ব'।

কিছুই বলেনি একালের কবি, শুধু মুগ্ধাবেশে
দেখেছ তোমার মধ্যে তন্বী গাছ, পালতোলা নৌকা,
পদ্মময় দীঘি আর শহরের নিবিড় উৎসব।

রঞ্জিতা সান্নিধ্য বড় বেশী মোহময় চিত্রকল্প তৈরী করে,
একান্ত আমারই দিকে বয়েছিলো তোমার গোলাপী হৃদয়ের
মদির নিশ্বাস আর সে বিশ্বাসে আমরা দুজন
অপরাহ্নে হেঁটে গেছি কলেজ স্ট্রিটের
অলৌকিক ভিড়ে, ফুটপাতে ফুটেছিলো মল্লিকা টগর জুঁই
তোমার হৃদয়ে উন্মিষিত
আমারই কবিতা আর চোখের পাতায় শতকের অনুরাগ।

রঞ্জিতা আবার কবে দেখা হবে আমাদের কোন
বিকেল বেলার কনে-দেখা আলোর মাথায় কোন
সে কবি সভায় কিংবা ফুটপাতে ?

রঞ্জিতা, তোমাকে আমি ডেকেছি ব্যাকুল বারংবার
ডেকেছি আমার
নিজস্ব বিবরে। এই চরাচর ব্যাপী অসম্ভব হট্টরোলে
অসহায় আমার এ কণ্ঠস্বর কি যাবে না ডুবে ?

কী করে আমরা ফের হবো মুখোমুখি
বিচ্ছিন্নতা বোধের পাতালে ?
ছদ্মবেশী নানা দেশী ঘাতকের খড়্গের ছায়ায়
কি করে আমরা চুমো খাবো ?
কি করে হাঁটবো আনবিক আবর্জনাময় পথে ?

ভীষণ গোলকধাঁধা রাজনীতি, আমরা হারিয়ে ফেলি পথ
বার বার, পড়ি খানাখন্দে, মতবাদের সাঁড়াশি
হঠাৎ উপড়ে ফেলে আমাদের প্রত্যেকের একেকটি চোখ। যে ভূখণ্ড
রঞ্জিতা তোমার আদিবাস, তার মাৎস্যন্যায় দুচোখের বিষ
এবং আমার মধ্যে নেই বংশবদ ছায়া।

হয়তো কখনো আর কলকাতায় যাবো না এবং
তুমিও ঢাকায় আসবে না। তাহলে কোথায় বলো
দেখা হবে আমাদের পুনরায়, অচেনা পথের মোড়ে।
মস্কো কি পিকিং-এ নয়, ওয়াশিংটনেও নয়, ব্যাঙ্কক জাকার্তা
জেদ্দা কি ইস্তামবুল হামবুর্গ, কোনোখানে নয়।

আমরা দু'জন
হয়তো মিলিত হবো নাম গোত্রহীন
উজ্জ্বল রাজধানীতে কোনো, যারে ডাকবো আমরা
মানবতা বলে,
যেমন আনন্দে নবজাতককে ডাকে তার জনক-জননী।

মুজিব

নির্মলেন্দু গুণ

মুজিব মানে আর কিছু না
মুজিব মানে মুক্তি
পিতার সাথে সন্তানের
না লেখা প্রেম চুক্তি।

মুজিত মানে আর কিছু না
মুজিব মানে শক্তি
উন্নত শির বীর বাঙালীর
চিরকালের ভক্তি

মুজিব মানে আর কিছু না
এক যমুনা রক্ত
মুজিব মানে সমাজতন্ত্র
আমি মুজিব ভক্ত।

অপাংক্তেয় কবিতাগুলির প্রতি

বেলাল চৌধুরী

আমার এতকালের অপাংক্তেয় কবিতাগুলির প্রতি
এটা কি রকম ব্যবহার তোমার ?   কি করে যে বোঝাই তোমাকে
তোমার এ ধরনের ব্যবহারে কতটা দুঃখ পাই
তুমি কি কখনো বুঝবে না আমার দুঃখ ?   চাওনা বুঝতে ?

বেশ তো তাহলে এসো দেখা যাক না খতিয়ে
অবশ্য এটাও ঠিক যে যতটা না তুমি দিয়েছো
তার চেয়ে ঢের বেশী পাওনা জমেছে তোমার !

কিন্তু কবিতা আমার, তোমার কর্তব্যেও তো তুমি ব্যর্থ হয়েছে !
পারোনি আমাকে বিশিষ্টদের একজন করে তুলতে
অথচ কত কাজ ছিল এ জীবনে তোমার
আমার দ্বিধা বিহ্বল ভীরু পদক্ষেপে সাহস যুগিয়ে
নিখুঁত ও অব্যর্থ শব্দছন্দবন্ধে আমার চেয়ে
ঢের বেশী এগিয়ে যাওয়া, কবিতা আমার,

তোমার দায়িত্ব ছিল আমার প্রতি সবাইকে উৎসুক করে তোলা
তোমার অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক পংক্তির ভেতর
প্রায় রাজকীয় সুনিশ্চিত বিজ্ঞের মতন
আমার হেঁয়ালিভরা মুখের দিকে অন্তত একপলক তাকিয়ে দেখা ।

কবিতা আমার তোমার দায়িত্ব ছিল
আমার সম্পর্কে প্রয়োজন মত মিথ্যাচারণ, বাগাড়ম্বর
ফোলানো ফাঁপানো অতিরঞ্জনের—

হাজার হাজার পাঠকের শ্রদ্ধার তাপে আমাকে উষ্ণ করে তোলা
কিংবা একজনের মধ্যে শতসহস্রের
কেন্দ্রীভূত প্রগাঢ় সম্মানের নীচে উজ্জ্বল করে তোলা।

আমি জানি আমার শিল্পভূত মাংস
আমার মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাবে
আমার বাস্তবিক বেঁচে থাকাকে
পূরণ করবে আমার ব্যাহত ভালবাসা।

আমার মাথার ভেতর রত্নভূষণে সজ্জিত
এক কুঁজো বামন গোকুলে বাড়ছে অন্ধকার হাড়কাটা গলিতে;
কোনো পুরস্কার-টুরস্কারে যে কখনও শান্ত হবে না
কিছুটা অন্তরকমের হলেও, তারও আছে উচ্চাভিলাষ,

আমার কবিতা
তুমি তোমার স্রষ্টার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো,
তোমার সঙ্গে ইতি টেনে দেবো আমি সব সম্পর্কের
অস্বীকার করবো তোমাকে, অগ্রাহ্য করবো তোমাকে
যে জীবন তোমাকে দিয়েছি তাও পরিশোধ হয়নি
যে চুম্বনে তুলে এনেছি ভবিষ্যের সারাৎসার তাও এখনো
উগরে দিতে পারিনি

তাছাড়া তোমার উপর যে অকৃপণ ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি
তারও আসেনি কোনো সন্তান।

তোমাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো সৌর আস্তাকুঁড়ে
যেখানে হাওয়া এসে উড়িয়ে নেবে তোমাকে
বৃষ্টিতে ভিজবে তুমি, রোদে পুড়ে হবে ছাই
কঠিন শীত এসে মুছে দেবে তোমার অর্থকে
দুপুরের তারা আর নৈশহিম আন্দোলিত

মহাকাশযান মথিত মৃত্তিকা আর ভোরের নক্ষত্র
জ্বলবে তোমার সমাধিতে
কবিতা আমার, কি আর বলবো তোমাকে
তখন আমি নত মস্তকে হেঁটে যাবো
একাকী কিছুক্ষণ উদভ্রান্ত ও শোকার্ত

ফুঁ দিয়ে নেভাতে চায়

আসাদ চৌধুরী

তৃতীয় বিশ্বের কবি অন্ধকারে আলো রিফু করে
তার চোখে অন্তহীন বঞ্চনার জ্বালা
অন্ধকারে দূর অতীতের সুরভিত বাণী ভেসে আসে,
সেখানে মানুষ জয়ী, মানুষ মহৎ।

কীট্‌সের নিঃশ্বাসে বুক তার ভরে আছে,
লোড শেডিংয়ের রাতে উল্টে যায় বাস্তব মহিমা,
ভেসে আসে সুর,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্পবক্ষে নম্র নেত্রপাত
আলো আসে ভিখিরির মতো।

আলো কাকে ভালবাসে ?
সাদা নাকি কালো,
কার প্রতি পক্ষপাত আলোকের ?
আলো রিফু করে কবি,
ফুঁ দিয়ে নেভাতে চায় বিখ্যাত আঁধার

রফিক আজাদ

রফিক আজাদ

অত্যন্ত অপরিচিত লাগে এই নাম
বাবা-মার দেওয়া নাম ফেলে
নিজেকে নতুন ক'রে
তৈরি করতে গিয়ে

কী করে যে কবে বেছে নিলাম স্বেচ্ছায়
দুঃখময় এই উদ্বিগ্ন জীবন
কী করে কখন যে অসামান্য তৃষ্ণা জেগে গ্যালো
হৃদয়ের নিভৃতে, গোপনে অতিশয় সাধারণ
হাবাগোবা কদাকার বালকের বুকে—

তার তো জানার কথা
বাবা-মার-দেয়া বৈশিষ্ট্যবিহীন সেই নামে খুব সাধারণভাবে
সুখী হওয়া যেতো,
দুঃখ পেলেও তা হতো খুবই নগণ্য দুঃখ ক্ষণস্থায়ী
সামান্য ক'দিনের কাইতান শেষ হলে হেসে উঠতো
শরতের নির্মেঘ আকাশ।

এইভাবে অর্থহীন অস্থিরতার হাতে
নৈরাশ্যের অনিবার্য গহ্বরে সঁপে দিতে হতো না জীবন
কোনো কিছু যেন আজ আমাকে আটকে রাখতে পারছে না
মন ভালো নেই শরীর অসুবিধাজনক—

এইভাবে বেশীদিন চলতে পারেনা
হয়তো অচিরেই কোনো একদিন
কাপড়চোপড় খুলে দীর্ঘ রাস্তা ধরে দেব দৌড়
এর চেয়ে পুরোপুরি বাবা-মার দেয়া নামে ফিরে যাওয়া ভালো
হয়তো বা তাতে খুব সুখ ছিলা—
বড় ভুল হয়ে গেছে।

বাবা, তুমি কি আমাকে কোনো শাপ দিয়েছিলে ?
মা, তোমার মনের গভীরে কোনো ক্ষোভ ছিলো,
তোমার অজান্তে কি কোনো একটা দীর্ঘশ্বাস
পড়েছিলো তোমাদের প্রতি গাঢ় উদাসীনতায় ?

ক্ষমা করে দিও বাবা, ক্ষমা কোরো মা আমার
আমি তোমাদেরই ব্যর্থ অক্ষম সন্তান,
বড়বেশী ভুল হয়ে গেছে
কিংবা এ আমার ভুল জন্ম ?

একটু কি শাসন তুমি করতে পারতে না, বাবা,
কেন লাগালে না কষে দু'চারটে চড় ও চাপড়
আমার দু গালে ?

স্বেচ্ছাচারী সন্তানের সেটাই তো প্রাপ্য ছিলো ?
জ্যেষ্ঠ সহোদর ভাই আমার একমাত্র তোমারই চেষ্টার কোনো
ক্রটি ছিলো না, তোমার—

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তোমার আদেশ অমান্য করে
দুঃখের পথটাই বেছে নিয়েছিলাম তখন
কিন্তু আজ দুঃখভারাতুর এই ভারী দুর্বহ পাথর
আমি আর বইতে পারছি না—

আমি আর হাঁটতে পারছি না, তাই
আমার পা পড়ে যাচ্ছে
তৃষ্ণায় আমার গলা কাঠ
গনগন করছে শরীর—

দপ করে জ্বলে উঠছে শিরাগুলি
চোখ জ্বলে যাচ্ছে গা পুড়ে যাচ্ছে লু হাওয়ায়
অথচ পুরোটা পথই তো সামনে পড়ে আছে
এই সাহারা আমি কী করে পাড়ি দেবো মা—

হে আমার পরিপার্শ্ব আজ থেকে আবার আমাকে
রফিকুল ইসলাম খান হবার সুযোগ দাও না—
খুব ভালো হয় সেটা, নির্ভার আনন্দে পুনর্বার জীবনটা
শুরু করা যায়

সত্ত্বায় সকীয়তায়

কাজী রোজী

ভাত দিবার পারস না ভাতার হবার চাস্
কেমন মরদ তুই হারামজাদা
নিত্য রাইতে ক্যান গতরে গতর চাস্
পরাণ দিয়েই যদি পরাণ বাঁধা

যেজন বাঁচতে চায় তারেই লড়তে হয়
তামাম দুইন্যা জুড়ে বুঝছে এখন
নিঠুর জঠর জ্বালা সইতে পারে না বলে
সবাই সহ্য করে সব জ্বালাতন

কৃষক লড়াই করে জমিনে ফসল ভরে
সাত পুরুষের ভিটে আগলে রাখে
কানাকড়ি মূল্যের সে ভিটের দাম দিতে
কোটি টাকার মহাজন আড়ালে ডাকে

ছাওয়াল কানলি পরে পোড়া এ গতরডারে
হালের বৈঠা ভাবি দাঁড়ে দেই টান
হায়রে সোয়ামী তোরে ছুঁইয়া কইতে পারি
খরায় জমিন পোড়ে পোড়ে না পরাণ

এট্টু ভাতের লাগি এট্টু ত্যানার লাগি
তামাম গতরডারে বিলায়ে দিলাম
ভাত দিবার পারলিনে তবুও ভাতার হলি
হায়রে সোয়ামী তুই-ই ডাকলি নিলাম।

অশ্লীল সভ্যতা

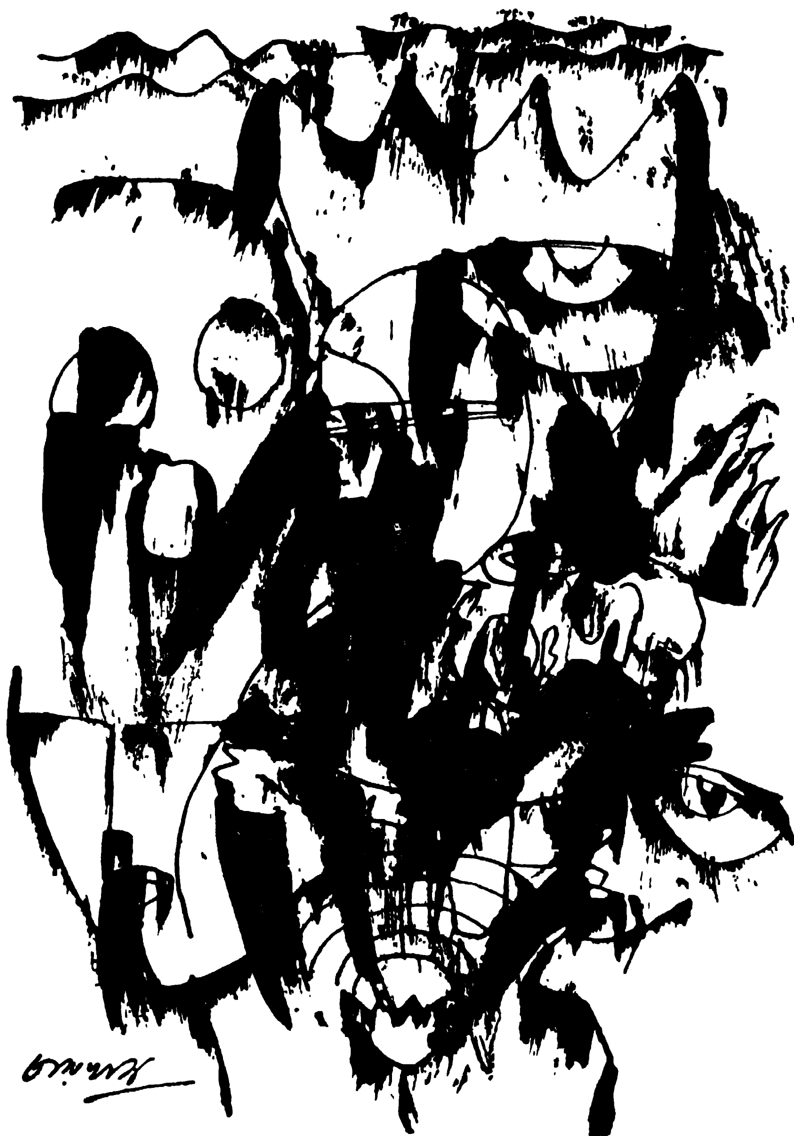
হেলাল হাফিজ

নিউট্রন বোমা বোঝ
মানুষ বোঝ না !

ভিন্ন স্বভাব

জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ

রাত ঘনিয়ে এলেই
পশুর স্বভাব আমার হৃদয়ে,
শিকারী হয়ে যাই
বুকের মাঝে নড়েচড়ে ওঠে জিঘাংসা।
শ্যেন দৃষ্টি সম্মুখে
সঙিন উচিয়ে ওঁৎ পাতি
দুই হাতের করতল,
শত্রুঘ্ন
প্রিয়ংবদার শয্যায় আহ্বান উপেক্ষায় আমি।
কেননা,
রক্ত শোষকের সাঁড়াশী আক্রমণ
বাইরে এবং চার দেওয়ালের ভেতরেও
তাই—
মশারীর মাঝেও সঙ্গিন উচাতে হয়
দুই হাতের করতল,
হিংস্রতায় তাই ঘুমের ব্যাঘাত!





পুজোর কবিতা

রবীন সুর

ভাদ্রের রোদ্দুর এসে শিউলির মাংস ভেজে নেবে।
বোধনের বাজনা-বাজা ভেঙে-পড়া বাঙালি সংসারে
প্রবাস পিছনে রেখে কে বা আর নিজ ঘরে ফেরে ?
হোলডল স্যুটকেস হাতে কেন্দ্রাতিগ ভ্রমণবিলাস,
গার্হস্থ্য গণ্ডীর রেখা ভুল মন্ত্রে নষ্ট হয়ে গেছে—
রাবণ রাক্ষস জানকীকে তুলে নিল এলো চুল ঝুঁটি ধরে,
গরুড়ের ডানা দু'টি খসে গেছে তেজস্ক্রিয় বিষে !

পাখিরা ওড়ে না। বন উপেক্ষায় মরুর চোয়ালে।
ছায়া রৌদ্রে লুকোচুরি খেলা বন্ধ, না ফোটা কাশের
ধূ-ধু মাঠে রাখালের বাঁশি আজ ভি. ডি. ও. ক্যাসেট।
অভ্র রোদ শুধু রোদ, অগ্নিবান ; বৃষ্টি ব্যতিরেকে
অ্যাসিড জমানো মেঘ, শুধু কাজ, বাণিজ্য জাহাজ
সপ্তসিন্ধু তেরো নদী পারাপারে চরিতার্থ খোঁজে,
রাবণ রৌদ্রের লোভ, শিওলির অরক্ষিত দেহ।

সামনে সোনালি আলো অফুরান দিন

অজয় দাশগুপ্ত

—(মামনকে মনে রেখে)

বারোমাস
দীর্ঘশ্বাস—
নিত্য দিন,
জীবন মলিন।
তবু স্বপ্ন বেঁচে থাকে
ফাল্গুনের কৃষ্ণচূড়া স্তবকে রঙিন।

তোমার জীবন ফুলে ভরো,
থরোথরো—
বিকশিত হও
যেখানে পাহাড়ে পাখি হয়েছে বিলীন।

পলাতক আশা,
বাঁধে বাসা,
ফুলের আভাস
আনে উল্লাস,
হৃদয়ের মর্ম জুড়ে ধ্বনিত বীণা বাজে রিনরিন।

আসন্ন সকাল,
ছিন্ন করে দিক হাল ;
দূরে সমুদ্রের উপর,
জলের অতল জুড়ে খেলা করে মাছেরা প্রবীণ।

তুমি তার অনুগত
কোথাও সতত
হয়ে গেছে ধুয়ে মুছে সাফ,
মনের ভেতরে রাখা গোপনতা, অবরুদ্ধ পাপ ;
সামনে সোনালি আলো অফুরান দিন।

সুচরিতাকে ভালবেসে

প্রণব কুমার আইচ

আমি জীবনকে ভালবেসেছিলাম
তাই মৃত্যু আমাকে
গভীর ভাবে ভালবাসে।

আমি আমাকে ভালবেসেছিলাম
তাই আমার 'আমিত্ব' গেছে খসে।
হৃদয়টা নয় স্তব্ধ, তাই
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে।

পাহাড়ের একদিকে রৌদ্র
আর একদিকে বৃষ্টি।
সুচরিতা বলেছিল—
মৃত্যুকে ভালবাসলে
তুমি জীবন পাবে
আমাকে ভালবাসলে তুমি
তোমাকে পাবে।

জীবনানন্দের লাসকাটা ঘরের
টেবিলটা তাই আমায়
হাতছানি দিয়ে ডাকে।
যেখানে আমিও পাব
আমার আমিত্বকে।
তাই সুচরিতা তোমায় ভালবেসে
মৃত্যুকে ভালবেসেছি আমি
জীবনের চেয়ে।

নারী

শৌনক বর্মণ

তৃষ্ণা বোঝ, তৃষ্ণালু ঠোঁট দেখনি অবজ্ঞায়
কি অসহ্য দহন সারাদিন ;
শূন্য করতলে চাইলে তৃষ্ণার জল
ঝর্ণা দেখাও, এ্যতো ছিলে দীন ?

না কি ছিলাম অযোগ্য, অন্ধকার ?
নিপুণা নারী তুমি আসোনি কাছে
দিয়েছো ফিরিয়ে বারবার ।

মাড়িয়ে প্রত্যাশার বাগান দু'পায়ে তুমি
শুধু রেখে গ্যাছো অসবুজ বিস্তীর্ণ তটভূমি
এ কেমন অহংকার ?

একা নই

পারুল ঘোষ

আজ আমি একা নই আজ আমি সকলের সাথে,
আমার সহস্র শির দ্বিসহস্র আজ মোর বাহু
মৃত্যুরে ডরিনা আমি, দারিদ্র্য দুঃখের দৃপ্ত রাহু
আজিকে নির্জ্জীত হবে, জর্জ্জরিত হবে মোর হাতে

বেদনার মহাসিন্ধু আলোড়িয়া উদ্দাম আঘাতে,
আনন্দের সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে উন্মাদ উদ্বাহু,
নাচিব দুরন্ত নৃত্য—ধরিত্রীর নাড়ী শিরা স্নায়ু
চঞ্চল উদ্বেল করি যাবো সুধা ছড়াতে ছড়াতে।

কে কাঁদো ক্ষুধার দাহে? লাঞ্ছনায় কে আছো অধীর?
কার চোখে গাঢ় হয়ে নামিয়াছে দৈন্যের কুয়াশা?
বক্ষে কার তিলে তিলে শুকায়ে আসিছে ক্ষীণ ভাষা?
ওঠো সব, জেগে ওঠো, বারেক উন্নত করি শির—
সাগ্রহে তাকায়ে দেখো—নিদ্রা ভঙ্গে আজ পৃথিবীর
জেগেছে বঞ্চিত যারা বুকে নিয়ে সঞ্জীবনী আশা।

কামনায়

পূর্ণেন্দুবিকাশ মণ্ডল

সূর্য্যের প্রখর করে জলধির বারি
মেঘ হয়ে আকাশেতে ওড়ে, জলভরা
ব্যথিত অন্তরে কাঁদে সৃষ্টি কামনায়।
মৌসুমীর স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে ঘনশ্যাম
বিরহিনী পৃথিবীর উত্তপ্ত হৃদয়
প্রেমের শীতল স্রোতে ধৌত করে দেয়।
সবুজ যৌবন জাগে অঙ্গ ভ'রে তার।

মৃত্তিকাজননীবক্ষে বাৎসল্যবাসনা
কৃষকেরে নিয়ে আসে নীরস প্রান্তরে
শ্যামলী দুহিতা ওঠে হলের কর্ষণে।
অরণ্যের সঙ্গ চায় নিঃসঙ্গ পাষান,
স্নেহ তার ব্যক্ত হয় তটিনীধারায়,
পাহাড়ের অঙ্গ শোভে বনউপবনে,
সঙ্গসুখ দেয় তারে নিঃসর্গ সুন্দর।

সূর্য্যসাথে পৃথিবীর মিলন-পিপাসা
নিয়ে আসে দিবসেরে রজনীর পাশে।
সূর্য্যের কিরণ লভে তমসার শশী।
যৌবনে জীবনপথে মিলন-কামনা
নারী-পুরুষেরে বাঁধে প্রেমের বন্ধনে,
সংসার সমুদ্রে উঠে হাসি-অশ্রুরাশি।
মিলনবিরহ ফোটে শিল্পীর ধেয়ানে।

বীজের অদম্য ইচ্ছা প্রসূন প্রকাশে,
পরিমলে লুব্ধ হয়ে অলিকুল আসে,
বক্ষ তার ভ'রে দেয় অসংখ্য চুম্বনে।
স্রষ্টার অমৃত ইচ্ছা—অনন্ত ভুবন।
সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা-ভূধর-সাগরে
বিশ্বের সৌন্দর্যরাজে জড়ে ও জীবনে,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় মিলে ঐকতানগানে।

হাঁটু গেড়ে পৃথিবীর কাছে

ভরত ঘোষ

বসন্তে প্রার্থনা কিছু ছিল এই পৃথিবীর কাছে ;
অনেক বিমান-পদাতিক-সমুদ্রযান ঢেউ
গ্রহণের জ্যামিতিক ছায়া তারপর
এ মাটির চাল বেয়ে নেমে গেছে—

হেঁটে গেছি আমিও অনেক, দলে গেছি
প্রান্তর—হলুদ পাতার অজস্র মড়কের স্মৃতি
বুকে নিয়ে শীত শীত অলস প্রহর
কাটিয়ে দিয়েছি একা—দেখেছি অনেক

মিষ্টি রোদের খোঁজে উড়ে যেতে পাখিদের
তারপর শূন্য আকাশ, চাঁদের গুহার মত
অন্ধ-নষ্ট-খাঁখাঁ বুক দেখে পৃথিবীর
নিজের বুকের ছবি ভুলে গেছি—প্রার্থনা !

কখন প্রত্যাহার করে নিয়ে তাও
হাঁটু গেড়ে বসে আছি পৃথিবীর কাছে।

ভিতরঘর

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিতরঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দাও
সমস্ত সতর্কতা নিয়ে চুপচাপ
বসে থাকো ঘরে
অন্ধকারের খাড়া দেওয়াল তোমার সামনে ও পিছনে
এই মনোভাব একদিন তোমাকে সঠিক যুক্তি দেখাবে

দিনে দিনে বেড়ে উঠবে তোমার সাহস
অনুসরণ করতে করতে কেউ এসে দেখবে ভেতরটুকু
স্থূল একটি চিন্তা ঘুরপাক খেতে খেতে
তাদের জানাবে তোমার পরিচয়

তুমি কিছু জানবে না বুঝবে না
শুধু ভিতরঘরের অনুসরণ তোমাকে
নিয়ে যাবে অনেকদূর ।

প্রতীক

অসিত দে

যতখানি যাওয়া যায়
এগিয়ে যাই চল।
এভাবে বসে, থমকে থেকে,
সাঁত—পাঁচ ভাবলে ঐ-ই হবে
যাওয়া হবে না আর আদৌ।
আজ কিংবা আগামীতে।

যতটুকু সময় আছে হাতে—
গুণে বলার
দরকার নেই কোন।
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে
এখান থেকে এখন।

পথে যতই আঁকা
থাক বিপদের আলপনা
উপায় নেই আর।
অন্য কোন একটাও।
এই পথেই যেতে হবে
বিকল্পের বড় অভাব।

এস, হাত ধরে এগিয়ে যাই
এ পথেরই বুক চিরে
যত সব বিপদের ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে।

সময়

কিরণশঙ্কর মৈত্র

সামনের দুটো দাঁত আগেই খসেছিল
নাকের ডগায় চশমা ধরেছে ছাতা,
কিছুদিন আগে চুলে শান্তি পতাকা উড়েছে
এখন চকচকে কালোর যৌবন।

তারপর ধীরে ধীরে বহু কিছু বদলাবার ধাক্কা
লৌকিক কায়দায় যখন কুলোল না
পালালেন পাহাড়ী শান্তিতে
ঝিরিঝিরি ঝর্ণার ধারা
বরফে-ঢাকা দেবভূমি
দূর-পাহাড়ের দিকে তাকাতে তাকাতে
তারপর একদিন
সব কিছু অর্থহীন মনে হলো।

রোজনামচা

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

আমার মনে পড়ছে তোমার সাদা পা
অসম্ভব বৃষ্টি হচ্ছিল তখন
এরকম নিঃস্ব চিত্রময়তার মধ্যেই
আজকাল জীবন নিয়ে আমি বাঁচি

অসম্ভব,পারা যাচ্ছে না ব্যথার সঙ্গে অসামাজিক চলতে ফিরতে
গা পুড়ে কালো, হাতে মরা খরগোশ নিয়ে যেন ফিরছি
জামার কলার অব্দি আকাশ

অথচ একদিন তোমার সাদা পা
স্নানঘর থেকে উত্তেজিত আমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হাত তুলছি, নাও, আমার সম্মানিত সমর্পন

আর পাখির দিকে তোমরা তীর ছুঁড়ো না
আমি পাখি চাই না

নদী ফেলে বহুদিন চলে এসেছি
এখন ঘুমোতে ঘুমোতেও দেখতে পাই
হৃৎপিণ্ডের চারটে খোপে রোজদিন হোঁচট খাচ্ছে রক্ত।

বাসা

সরল দে

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রোগের বাসা দেহে,
ঝাঁকড়া চুলে কাগের বাসা, ঐ ছেলেটা কে হে ?
ঘুঘুর বাসা ভাঙতে এলেন স্বজন পোষণ সাহা,
তোমার বাসা গাছতলাতে ? আহা আহা আহা

কেউ জেগেছো, কেউ

রাখাল বিশ্বাস

দু'চোখ জুড়ে দুলতে থাকে ফুলঝুরি দেয় দোলা
যাচ্ছে না তো ভোলা,
জ্বলতে থাকে আকাশ-প্রদীপ মেঘভাসি আর টানে
কোন স্মরণের গানে ।।
এই এখানে আমরা জাগি আর যে নদীর ঢেউ
কেউ জেগেছো কেউ ?
সব্জে মাঠে খুশীর হাওয়া নীল খুশী এই ধানে
সেই নবান্ন গানে ।।
তার ভেতরই সাঁতার কাটি তার ভেতরই খেলা
ঠিক দুপ্‌পুর বেলা ।
মন মানে না বদ্ধ ঘরে চুপটি করেই থাকি
চড়ুই শালিখ নাকি ?
ডাকছে কোথায় প্রাণখোলা ওই মন খোলা কোন দিক
বটের পাতায় ঠিক !
কোন চরাচর থমকে থাকে আঁধার ফেলে দূরে
সোনালী রোদ্দুরে ।
পুষ্করিণীর নিথর জলে কাঁপতে থাকে জানি
জ্যোৎস্না মায়া খানি ?

কোন খেদ নেই

রবিদাস সাহারায়

কি করলে কি হতো কখনো ভেবে দেখিনি,
যদি ঠকে থাকি তাতে কোন দুঃখ নেই।
পৃথিবীতে সব কিছু মায়া নয়, ফাঁকি নয়,
তাই আজো মনে বিশ্বাস রাখি।
বৃষ্টি শেষের রামধনু সাতরঙ ছড়ায়
বিকেলের মুখে রোদ মাখানো হাসি
আকাশকে ভরায় আশ্বাসের কৌতুকে।
ফসলের স্বপ্ন টুটে গেলেও কিষানের চোখ থেকে;
অকাল নবান্ন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে।
গোলাপের লগ্ন শেষ হায় গেলেও
গৃহপ্রাঙ্গণে রঙের মেলা বসাবে অজস্র দোপাটি।
জানি যা হারিয়ে গেছে তা পাব না।
না চাইলেও পেতে পারি হয়তো এমন কিছু।
তবু আমার মনে আজ কোন খেদ নেই।
স্বাতি নক্ষত্র লগ্নে এক বিন্দু শিশির
ঝিনুককে এনে দেবে হয়তো মুক্তার সম্ভাবনা

মহাকালের শব

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনও হয়নি পোড়া তাই সভ্যতার শ্মশানে জ্বলছে মহাকালের শব,
মুগ্ধ হয়ে তাই দেখে যাবো, এই শেষ প্রাপ্য,
হে ঈশ্বর—একবার ফিরে দেখো
একবার এই পৃথিবীর সমস্ত সত্বাকে রূপান্বিত করো আপন জ্যোতির্ময়তায়,
এই দিগন্তের প্রচণ্ড অন্ধকারে এখন শুধু প্রায়শ্চিত্তের পালা,
দৌড়ে যাবো বাঁচতে, বোধহয় মৃত্যুর দিকে।
মহাকাল দেখেছি কল্পনেত্র মেলে, চারিদিকে অহংকারের কুয়াশা,
কোথায় রয়েছে পড়ে ভাগবৎ, গীতা, বেদ,
লেনিন আর গান্ধীবাদের তকমা এঁটে যারা,
অহরহ মানুষের রক্ত চুষে, বুক ফুলিয়ে টেবিল বাজায়
বিধানসভা, লোকসভার রঙ্গমঞ্চে,
তুমি তাদের কী উপহার দেবে, তোমার পোড়া ছাই
নয়তো নিউট্রন বোমের ধোঁয়া।
স্বর্গলোকে যেতে চাইনা মিথ্যেকে সত্য বলে মানবোনা কখনও,
গঙ্গাসাগর থেকে যোশী মঠে যারা শান্তির বাণী ছড়ায়,
তাদের নেই কী কোন অবদান!
একবার শুধু কিছু সত্য নেমে এসে
মুছে দিক এই যাবতীয় ব্যবধান।

কবিসভা

দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়

নমস্কার,
সকলেই খুব বিচলিত,
ঘড়ির কাটায় ঢং ঢং করে ছ'টা বাজলো।
পাঁচটার কবিসভা, ছ'টায় শুরু হ'ল।
পথে আসতে শুনলাম, কেউ কেউ বললে
কবিদের খেয়ালে সময়টময়, সবকিছু ভুললো।
টিম টিম করছে আলো।
ছড়ানো ছেটানো শ্রোতার দল।
সংখ্যায় যতোই কম হোক
হলটা তবু মোটামুটি ভরলো
ঘড়ির কাঁটায় ঢং ঢং করে ছ'টা বাজলো।
কারও মাথা ব্যথা নেই কে কি বললো
কে কি বুঝলো, কবি সভা এমন করেই চললো।
সভ্যতাকে ধরে অপারেশন টেবিলে তুললো ;
খোঁচা খোঁচা দাড়ি হাতে লম্বা ছুরি
সভ্যতাকে খাইয়ে দিলে ঘুমের একটা বড়ি
তখন সভ্যতার ঢুলু ঢুলু চোখ, আগোছালো কণ্ঠস্বর,
হাতে জ্ঞানের বিশাল বোঝা
রক্তমাখা হাত উঁচিয়ে কবিরা অনেকিছু বললো,
তারাও বোঝেনি শ্রোতারা কি শুনলো
তবুও সভার শেষে বিদগ্ধচিত্ত নিয়ে, গদগদ হয়ে একপেট পানাহার
আর তারপর
বড়ো ক্লান্ত বক্তা কবি, পরিচালকমণ্ডলীর দেহে ভর রেখে
রাতে বাড়ী ফিরলো।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে

সৌরীন গুহ

ওঠানামার বিস্তৃতি
সবই জানি
ভাগীরথী নদীর
নাব্যতা কমে গেছে
ভয় হয়, হয়ত প্রতারিত করবে
আমার এই জন্মভূমি ;
তবুও তোমাকে বেসেছি ভাল
আধখানা চাঁদেই ওরা হয়ত ক্ষুধা মেটাল
নৃত্যবাদ্য সহ কাঁটা চামচের প্লেটে
তোমাকেও টেনে নিল।

দুটি কবিতা

পরিমলচন্দ্র নাগ

১

দেখছি বসে টিভির পর্দায় বিশ্বকাপের খেলা।
জীবনে জীবন মেলে রঙিন টিভির পর্দায়!
অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর প্রাণচঞ্চলতায়
মুহুর্মুহু হোঁচট খায় এ তৃষিত প্রাণ,
বিচিত্র গ্যালারির উপর চোখ রেখে!
ক্রসবারে নিবন্ধ দৃষ্টি বিনিদ্র রজনী
জাগায় যে কত রাত, রাতজাগা এক পাখি!
মেতে ওঠে বিশ্ববাসী ফুটবল খেলা নিয়ে,
সবুজ ঘাসের মাঠে, সতেজ সজীবতায়
আত্মভোলা, মাতামাতি খেলা-খেলা নিয়ে।
তোমরা যারা মেতে উঠছো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায়
ধুন্ধুমার এ বিশ্বে, আত্মহারা তারকারা
নামবে ধরার মাঠে, জ্বলন্ত নক্ষত্রযুদ্ধে।
হবে কি তা দৃষ্টিনন্দন রঙিন টিভির পর্দায়
যেমন করে দেখছি বসে বিশ্বকাপের খেলা?

২

যারা এলো তারাতো রইলো না কেউ
সবাই চলে গেল একে একে জীবনের গান গেয়ে।
ভাঙ্গা হাটে কেবল কালপেঁচারা ডাকে।
যারা রইলো তারাতো এই বিশ্বেরই বাসিন্দা।
দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে কোটরে
রাতের আঁধারে দিব্যি নাচানাচি করে,
জানিয়ে দেয় জীবনের প্রহরগুলি এক এক ক'রে।
আঁধার রাতের বাসিন্দারা জেগে থাকে
মশাল-মশাল চোখ নিয়ে,
আমাকে শাসিয়ে যায় কর্কশ স্বরে।
লক্ষ্মীপেঁচার কান তো দেখা হয়নি আজও
মায়াবী চাঁদের আলোয় অদৃশ্য প্যাঁচারা ডাকে।
জ্যোৎস্না রাতে একলা ঘর খাঁ-খাঁ করে।

এই মুহূর্তে

শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই মুহূর্তে
যে কোনো একজন,
পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে
লড়াই করছে সকালের জন্যে ;
সমস্ত প্রাচীর খসিয়ে ফেলে
যে কোনো নারী
ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে ;
এই মুহূর্তে
প্রথম অপাপবিদ্ধাকে দেখছে
যে কোনো জাতক ।

সমস্ত বিশ্বাসকে বুকে নিয়ে
যে কোনো একজন কবি
ফাঁসির দড়ি গলায় পরছেন
এই মুহূর্তে ।।

রেল স্টেশনের যুবক

শুভব্রত রায়চৌধুরী

রেল স্টেশনের কাউণ্টারে
দাঁড়াল এক যুবক
মুখটি তাহার ম্লান
হাতটি বাড়িয়ে আছে
ব্যস্ত প্যাসেঞ্জারের দিকে,
যদি দশটি পয়সা মেলে।

ব্যস্ত হুড়োহুড়ির মধ্যে কেউ দেয়
কেউ বা না দিয়ে দেয়
গালি, শোনায় নীতিকথা আর
ভর্ৎসনা করে যুবকের দল,
ভাঙা হৃদয়, ছন্নছাড়া মদ আর গরীবকে
কে যোগাবে টাকা, কেইবা দেবে
ধার—ভাবছে যুবক
মুখটি তাহার ম্লান।
হাতটি চলে যান্ত্রিক চালে
ব্যস্ত প্যাসেঞ্জারের দিকে
যদি দশটি পয়সা মেলে।

পথ ব'লে দাও কোন্‌খানে

গৌতম কর

শহর ছেড়ে আমি যেতে পারি চতুর্দিকে,
বাড়াব পা, ভেঙে যাবে মাটি নীচে যাব—
হঠাৎ দু'হাত তুলে উপরে চেঁচাব : 'তোলো হে।'

কিংবা নিঃশব্দ যাব বনে। দেখব ঘুরে ঘুরে
যেখানে ভালোবাসে সাপসাপিনী। দাঁড়াব, দেখব
যেন সোনার টিলায় ভেঙে পড়ছে সূর্য। গোধূলিময়—

শহর ছেড়ে তোমার দিকে চ'লে যেতে পারি।
তোমার মধ্যে থাকব, বলব, 'খেতে দাও দুটি।'
তোমার মধ্যে বাঁচব কিংবা হারিয়ে যাব। বাঁচব ও হারাব।

মা

দীপক কুমার দাস

ওগো মা তুমি কি অগ্নিশিখা ?
তব শিখায় দেখিয়াছি এ ভুবন।
ভালোবাসিয়াছো দেখাইয়াছো আলো,
স্পর্শ করিতে দাও মা তব চরণ।

ওগো মা তুমি, কি দুর্গা দেবী ?
তব আশীর্বাদ মাটির চেয়েও ভারী।
তুমি যে মা গৃহের কুলবধু,
সত্য মা তুমি আদর্শ নারী।
ওগো মা শতকোটী জানাই প্রনাম।
করিতে পারি যেন তোমাতে ভক্তি শ্রদ্ধা
চাহিগো মা শুধু তব আশীর্বাদ,
পারি যেন হইতে কোন যোদ্ধা।

কথাগুলো যদি

মঞ্জু কুণ্ডু

কথাগুলো যদি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় মোরে এমন করে,
কী হবে দু'হাতে আর পরশ করে !
কথার যে গাঁথা মালা কণ্ঠে জড়ায়,
কোন ফাঁকি দেখি নাতো তার ।
প্রাণের সকল আর্তি নিয়ে কথা আসে,
কথা ভাসে শব্দের জগতে ;
কথাই প্রাণের যেন শব্দময় রূপ ।
ফুল দিয়ে গাঁথা মালা ভুলও হয়ে যায়,
হুল হয়ে কণ্ঠে বিঁধায়,
কী হবে সে মালা দিয়ে তবে ?
সোনালী সকালে বিবর্ণ শুকনো ফুলগুলি
ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মত দুলিবে গলায় ।
তার চেয়ে সেই ভাল, কথার মালিকা
দিয়ো মোর কণ্ঠে পরায়ে,
কখনও হবে না ম্লান, ফুরাবে না সুগন্ধের রেশ
শ্রুতির জগৎ হ'তে বার বার ফিরে ফিরে এসে
স্মৃতির জগতে—
জাগাবে নূতন করে পুরোনো প্রত্যয় ।

দুটো কবিতা

প্রমোদরঞ্জন সাহা

। ছিলো না রক্ত ।

ছিলো না রক্ত ছিলো না হৃৎপিণ্ড
সে এক কাগজে বাঘ
মগজের উৎপাতে তবু সে উন্মাদ
অন্ধকারে হাত নাড়ে
বুলেটিন বানায়
সেই বুলেটিনে মুখের করাত
ভাঙে ট্রাফিক পুলিশের
লালমাড়ি ও সাদা দাঁত

। ভাঙেনি অন্ধকারের ডিম ।

ভাঙেনি অন্ধকারের ডিম
তপস্যার অভাবে ভোর হয়নি এখনও
রাজপথে আলোর বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে
যায় না কেউ হেঁটে
রজনীগন্ধার বনে আগুন লাগেনি
ভোর না হলে উৎসব হয় না শুরু

সোমা নামে মেয়েটি

গৌতম রায়

ঐ দূর নীলে রাতজাগা নীল নীল তারাদের মতো ঠোঁটের কোণে
একটুখানি হাসির আভাষ নিয়ে ওগো মহুয়ামাতাল—
গাঁয়ের মেয়ে এমন তন্দ্রাহারা জ্যোৎস্না বেলা কোথা চলেছ
নীরবে বেতের জঙ্গল ভেঙে একাকী অনভিজ্ঞ ছন্দে ছন্দে ?
তেঁতুল ঢাকা সাঁওতাল পাড়ার পায়ে পায়ে চলা পথ
গেছে বেঁকে বেঁকে রাঙা পাড়ের সবুজ চেলির মত সেথা
কেন তোমার চলা বিরামহীন ওগো নববরষার কিশোরী
দূত তোমার পাগল জীবন-দোলায় এবার ঘুম আসুক—
ঘুম আসুক তোমার শান্ত বক্ষ নীড়ে
কল্পনার স্বর্গ হতে যে কোন বার্তাখানি লয়ে নীলাঞ্জনা
আঁখি দুটি যা পথের নব দিগন্ত—পটে কার লাগি
গাঁথিছে শুভ্র শেফালীর মালা কারে ভালোবেসে ?
শব্দের ঝিকিমিকি সহস্র জোনাকির মুখর মূর্ছনায়
তুমি আজও তারে স্মর কী ওগো কালো মেয়ে ॥

বন্ধু

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু তোমার সেই কবি বন্ধু
যাকে তুমি কবিতা লিখে
পাঠাতে লিখেছ তার ত অপমৃত্যু
ঘটেছে অনেক দিন আগে
অভাবের বাস্তবে বিদগ্ধ হয়ে
শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হয়েছে সে
অনেক দিন হোল। জীব মনস্তত্বের
আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থ বেঁচে থাকার
কোন পথই পেতে দেয়নি তাকে
অসহায় অবস্থার সুযোগে তার
শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত আত্মসাৎ
করে উদ্বাস্তু করে ছেড়ে দিয়েছিলো
যান্ত্রিক বাস্তব। নিজেকে বাঁচিয়ে
রাখার জঘন্ন উঞ্ছবৃত্তির পথে নেবে
আসতে মন চায়নি তার। পারেনি
সে অভ্যস্ত হতে যান্ত্রিক জীবনের
এ উদ্ব্যাস্ততায়।

সারারাত

নন্দলাল সেনগুপ্ত

সারারাত।

একা　　　　একা　　　　সারারাত।

শীতের ফসলকাটা হা-হা করা মাঠে সারারাত।

একা　　　　একা

　　　　ঘুরে　　　　ঘুরে

কেউ কেউ কখনো ফেরে

　　　　কেউ কেউ ফেরে না।

আর আমি জানি

কিছু কবিতায় পাওয়া মানুষের গল্পগাছা

তারাও ঘোরে

　　　　ঘুরে মরে

কখনো বা জোৎস্নায়

কখনো বা নিঝ্ঝুম অন্ধকারে সারারাত।

সারারাত।

একা　　　　একা　　　　সারারাত।

একটু উষ্ণতায়

মালতী পাল

ভালবাসা জাগিয়ে রাখো তেমন করে
বাঁচাটা যেন বৃথা না হয়।
মাতাল করা সেই গন্ধে নেশা ধরাও
জীবনটা যেন পথ খুঁজে পায়।
ভালবাসার মধুর সৌরভে
স্বপ্নময় যে হৃদয়
বাস্তব আর কল্পনার ককটেলে
একটা চুমুক দিয়ে
যেন সার্থক হয়।
নিঃসঙ্গতার হিমেল হাওয়া
তুচ্ছ করে দিন যায়
একটু উষ্ণতায়
সেই উষ্ণতাকে জড়িয়ে ধরে
বাস্তব যেন স্বপ্নকে
চলার সঙ্গী পায়।
দিনের আলো নিভে যাবার আগে
শেষ করে নাও যত জরুরী কাজ
অসম্পূর্ণ কাজের জন্যে
যেন বসে থাকতে না হয়
দিনের অপেক্ষায়।

প্রবাসী

মহঃ রেজওয়ান আলি

কেন নিতি মন টানে
আমার গ্রামের দিকে,
যেখানে আকাশে-বাতাসে কানাকানি
শোন দীঘির পাড়ে উষায় রাঙ্গা মুখখানি
মনে পড়ে হৃদয়চিত্তে চোখের পলকে।
ঐ গাঁয়ে জনম আমার
প্রকৃতিতে ভাসে গন্ধ।
দেশে ফিরি যবে বিদেশ হতে
স্বাগত সম্ভাষণ পুকুর-পাড় পথে
উলুধ্বনির হারানো সুরে ধরণী বিমুগ্ধ।
ছায়া ভরা গ্রাম মনে হয় ম্লান
বিমর্ষ সুর আলো ও বাতাসে,
অবগুণ্ঠনে গ্রাম্য রমণীর চেয়ে থাকা মুখ
প্রাকৃতিক শিহরণে জাগায় উৎসুক
হয়তো আপনজন চলিছে প্রবাসে।

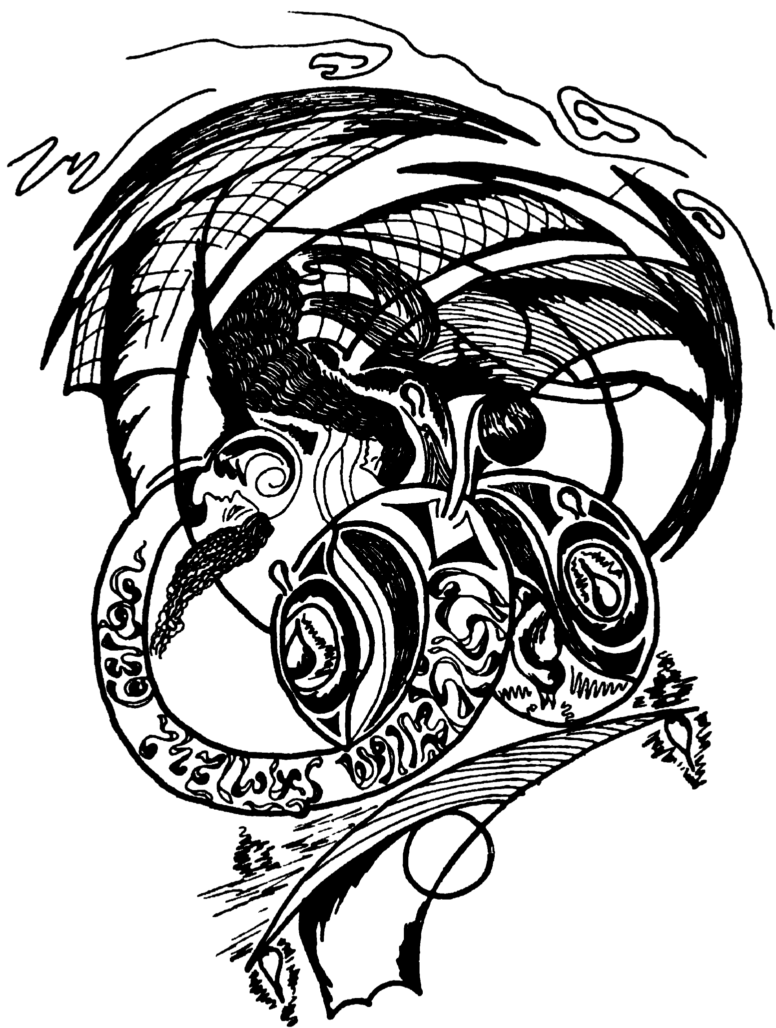
বদলায় না স্বপ্নেরা

কৃষ্ণকলি সিংহরায়

আমরা অবিকল কেউ এক নই
শীতের আকাশ বসন্তের ফুল, প্রিয় শরীরও নয়।
সবকিছু কেমনভাবে বদলে যায় সময়ের টানে।
কিভাবে বদলায় সব ? মানুষের দেহ, মুখ, কণ্ঠস্বর ?
হয়ত এ রহস্য লুকানো আছে সত্তার গভীরে,
পলি পড়ে চাপা থাকে হৃদয়ের মাঝে।
শুধু দেখি বদলায় না স্বপ্নেরা
অবিকল একই সাজে ঘোরে ফেরে,
পরিচিত পদঘাট, জনপদ, স্মৃতি সময়ের হাতে
ধীরে ধীরে বদলে যায়
স্বপ্ন শুধু পায় না নতুন চেহারা।
স্বপ্নের ঘেরাটোপে একইভাবে যাওয়া আসা করে
প্রেম, ভালবাসা, সুখ, দুঃখ, সৃষ্টি,
চিরদিন থাকে তারা স্বপ্নের সমান বয়সী॥



(৯)



অহল্যা জাগে

কানাইলাল বিশ্বাস

ঢেউ এর আঘাতে
তোমার হৃদয়ের পাড় ভাঙে,
জলস্রোত বয়ে আনে
নুড়ি, আবর্জনা
তোমার নিকানো উঠানের চারিপাশে।

ব্যঞ্জনবর্ণে গাঁথা মালা
তোমার সদর দেউড়িতে প্রহরায় নিযুক্ত ;
তুমি অপেক্ষায় রত
চারা গাছটায় ফুল ফোটাবে বলে।
চোখের সামনে মাটি কাঁপে, জল কাঁপে,
চারাগাছ কাঁপে ।

শুধু আলোর আলতায় তার ঠিকানা মিলে
···অহল্যা জাগে
বাউলের একতারাতে।

কায়া ও ছায়া

অজন্তা সেনগুপ্তা

কায়া ধীরে চলে যায় সমুন্নত শিরে,
ছায়া তার পিছে চলে তাকায়না ফিরে।
আলোকে উজ্জল কায়া, থাকে তার সাথে,
আঁধারে সে যায় যবে, ছেড়ে যায় রাতে।
কায়াকে জানায় ছায়া তুমি হবে লীন
আমি রব তব সাথে আলো যতদিন।
তোমা ছেড়ে যাই আমি আঁধারে নিশীথে,
নিস্প্রদীপ গৃহে যবে যাও শয্যাতে।
আলোকে তোমার সাথে রব দিবা এলে,
তুমি কায়া আমি ছায়া, থাকি অন্তরালে।
অশরীরী থাকি সাথে দিবসে নিশীথে,
ছেড়ে যাই গোধূলিতে রবি অস্তগতে।
কায়া মোর প্রিয় অতি, তবু অভিশাপে,
ছায়া হয়ে ঘুরি তব অতীতের পাপে।

একটি কবিতার জন্ম

ইলা সেনগুপ্ত

সৃষ্টির প্রথমক্ষণে প্রকৃতির সূতিকাগারে দুঃসহ আনন্দ বেদনার মধ্য দিয়ে জন্ম যার।
জগতের আনন্দ যজ্ঞে সত্য শিব সুন্দরের আরাধনায় পড়েছিলো ডাক তাঁর ॥
ক্রৌঞ্চ মিথুনের শোকে কাতর দস্যুরে যে দিলো শাশ্বত সত্যের সন্ধান।
দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে পেলো আদি কবির মহান সম্মান ॥
অধরা সে কাব্যলক্ষ্মীরে ধরিতে চাই মোর ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে।
যুগ যন্ত্রনার দুঃখেরে ভোলাবো কি মন্ত্র গেয়ে ॥
অনেক যুগ পেরিয়ে এসে ভুলেছি মোরা সত্য শিব সুন্দরে।
অপাপবিদ্ধা সে দেবীরে মোরা বসাবো কোন মন্দিরে ॥
পূতি-গন্ধময় আবর্জনা ভরা এ ধরণীর বুকে।
একটি শাশ্বত কবিতা লবে নাকি জনম আনন্দ সুখে ॥
ঊষার উদয় ক্ষণে নবীন কণ্ঠে স্ফুরিবে কবিতা।
সোনা ঝরা দিনের স্বপ্ন নিয়ে উদিবে সবিতা ॥
জগতের এ আনন্দ যজ্ঞে এসেছে সবার ডাক।
শ্বাশ্বত কবিতার জন্ম লগ্নে সকল বিভেদ দূরে যাক ॥

আশীর্বাদ

(ভাইতুল্য তপন চট্টরাজকে)
দেবাশিস সরকার।

পরের ব্যথায় ব্যথাতুর তুমি
হে মহান বন্ধুবর।
যেখানে নিজেকে দিয়েছ ঢেলে
অকাতর প্রাণ—মানবের পুণ্য চরণে,
যেখানে আপন হৃদয় প্রাঙ্গনে
অসহায় মানব মানবীর মৃত্যুবাণ হাতে রেখে।
জ্ঞানের ভাণ্ডার করেছো শূন্য
নিজেরে নিঃস্ব রিক্ত ভেবে।
তবু তুমি হীনতার ভোগ, হে পুণ্যজন।
ভোগ বিলাস পেছনে ফেলে
চলেছো কোথায়? কোন সীমানায়?
নিজে কৃতদাস পরের দরজায়
চাওনি কিছু আপন কোঠায়
সিন্ধুক ভর্তি মান-সম্মান? তাইতো মহান।

তুমি হেয় প্রার্থী দুষ্টিজনের,
তবু আমার হৃদয় মন্দির
ভরে থাক—
আমার খুশীর অশ্রুজলে।

মালবিকা এবং এক অনিকেত প্রেম

উমাশংকর

মালবিকা মালবিকা কোথায় ?
মালবিকা চিতার অনিকেত সুখের খাটে চলে যাচ্ছে বিশ্রাম ঘরে
শিরোপায় পাটে পাকান চুল চপচপ ভিজে যাচ্ছে
হাড় মাংস মেদ চামড়া লাল আগুনের শাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে ;
মালবিকা চলে যাচ্ছে।—যেখানে নীল। সফেদ রামধনু।
সারাদিন ডালের জলে ভেজান আঙুল—
আতপ চালের জলে ভেজান হাত হলুদ মরিচ জিড়ের গন্ধে
মালবিকা ছিল ক্লান্ত এক নারী।
সন্তানরে দিয়েছিল দুধ স্বামীর আদরে আহ্লাদে উত্তাপে রেখেছিল ভাড়াটে কুটির পরিপূর্ণ

এসব প্রতিদিনের সুখেদুঃখে শেষে শরীর পেকে বুড়ি বারান্দার ঝুল।
মালবিকা অর্ধশতাব্দী উত্তীর্ণ হয়ে এখন চলে যাচ্ছে
চলে যাচ্ছে মালবিকা লাল আগুনের শাড়ির ভেতর ...

ছুটে যাই

সুশান্ত ঘোষ

সুখ দুঃখের তরণীতে চড়ে
আমরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করি।
মসৃণ জেনেও
পথ চলতে চলতে
অসত্যের চোরা বালিতে
পা আটকে যায় কখনো কখনো।

আশা নিরাশায় দোদুল্যমান
হৃদয় শতদলে
ঘূর্ণিঝড় এসে
ছুঁয়ে যায় জীবন মৃণাল।

অন্তরের মধ্যে বৈশাখী,
বর্ষার স্পর্শ নিতে
মাঝে মাঝে ছুটে যাই—
কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে।

কোথায় মানবতা

সনৎ চন্দ্র চন্দ্র

(দেশে দেশে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে)
ওরা ভেঙে পড়া জনস্রোত আসে
কাতারে কাতারে সীমান্তের ওপার হতে।
ওরা জানায়েছে জনে জনে
দীর্ণ ক্লিষ্ট মরমের কথা—
সুপ্ত ধরিত্রীর বুকে
প্রগাঢ় সুষুপ্তি দীর্ণ করি
দানবের উৎকৃষ্ট উল্লাস
প্রমত্ত পাশব প্রবৃত্তি।

লেলিহান অগ্নিশিখা
লোলজিহ্বা প্রসারণ করি
করেছে ভূমিসাৎ
পর্ণকুটির হতে হর্ম্যপ্রাসাদ।
নারীত্বের মাতৃত্বের চরম অবমাননা
দলিত মর্দিত শুভ্র পুষ্পরাজি
দানবের কামনা ক্ষুধায়।
শিশুর কলহাসি থেমেছে হঠাৎ
নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে আগামী দিনের
নবজীবনের হয়েছে অবসান।

তাই বুঝি—
দিশাহারা মানুষের বিভ্রান্ত ক্রন্দন
কাঁদি ফেরে দিক হতে দিগন্তরে
শূন্য প্রান্তরে বিশ্বমনীষীদের
রুদ্ধ কক্ষদ্বারে অকারণ করাঘাত হানি।

বিশ্বশান্তি মৈত্রীর বাণী
শুধুই কি আস্ফালন শূন্য বাগাড়ম্বর ?
রিক্ত মানুষের এই আকুল ক্রন্দন
শুধুই কি মরিবে গুমরি
বিশ্বময় জুড়ি
মানবতার নিস্ফল আবেদন।

রোজের সকাল

অজিতেশ নাগ

রোজের সকাল দেখা দেয় আনমনে ; খবরের কাগজের নতুন আবছা গন্ধের-
বিষাক্ত নিঃশ্বাস, টিভির অ্যান্টেনায় বসা কাকের কর্কশ ডাক···
ঢেউ তোলে ; মনের ঢেউ মিলায় অতলে ।
হয়ত চেয়েছিলাম হতে সাংবাদিক,—সমাজ, পুলিশ, আইন আর কারাগার-
কয়েকটা শব্দের পাশাপাশি—আমি স্বপ্ন দেখি,
জেগে উঠে বিছানায় ···
পেয়ারা পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ আর—নতুন উনুনের চিরাচরিত—
ধোঁয়ার সঙ্গে ··কলের জল আসে···চুড়ির ঝনঝন ·
এঁটো বাসন আগুন ছড়ায় কলতলায়,
মনের দুরন্ত স্বাধীন উল্কা ছাই হয়ে নেমে আসে শক্ত জমিতে ।
ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে করুন রোদ টুকরো টুকরো হয়,
ঘরের পরিধির মধ্যে বাসি বিছানা আর তুলো বার করা বালিশে শুয়ে —
চালের ফোকর দিয়ে — অন্তিম মলিন আকাশের পানে চেয়ে —
আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি ।

বসুন্ধরা

মীনকেতন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষুধা তৃষ্ণায় জর্জর কেন বিশুষ্ক কেন প্রাণ ?
দুখ-ছায়া কেন উজল আননে অমৃতের সন্তান ?
কেন পরিধেয় চীরবাস তব, কেন মুখে নাহি হাসি ?
শক্তি, সাহস, পৌরুষে জাগো ; এমন্ন জড়তা নাশি।
স্তবকে স্তবকে লুকায়ে রেখেছি ভাণ্ডারে ধন রাজি
লহ তুলি সব খোঁড়াখুঁড়ি করি, লও গো ভরিয়া সাজি,
লাঙ্গল, কোদাল আর নিড়ানীর আঘাতেতে বারে বারে
সোনার ফসল ল'য়ে যাও ঘরে, যত পার ভারে ভারে।
কৃষক তোমরা, আমি কৃষিরাণী, জননী দুঃখ হরা
শস্যদায়িনী, বিশ্বপালিনী, শ্যামলী বসুন্ধরা।

ইচ্ছে করে,—ল্যাং মারি

অনুপ কুমার কুইলা

ইচ্ছে করে,—ল্যাং মারি—
আজকের উলঙ্গ সমাজকে ;
চেতনা 'আর' অবচেতনার মাঝে
মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে
কাঁচকাঁচার মূল্য বিক্রীত হয় জলের দামে।
আমি চেয়ে দেখি রাস্তার পাশে
জড়ো করা জঞ্জালের স্তুপে ;
পড়ে থাকে কতো ভ্রূণ
এ পৃথিবীতে বাঁচবার পাস্‌পোর্ট না পেয়ে।
মনে হয় ছুটে যাই ওদেরও ল্যাং মারি
মুখ থুবড়ে ওরাও পড়ুক ঐ স্তুপে
চিৎকার করুক বাঁচবার জন্যে।
তবুও আমি তুলবো না বরং
সব্বাইকে বলবো আরো বেশী করে ল্যাং মারতে ॥

বৃক্ষের শিকড়ে যাব

জয়তী রায়

এখন আর কিছু নেই
তুমি যাও—
আমি একা হরিতকী বনে যাব,
অমল শিশির ফোঁটা করতলে রেখে
খুব ভোরে শুনবো পাখির গান,
যদি পড়ে থাকে শিউলি বকুল,
দু' একটি ফুলের কুঁড়ি হাতে নেব ঃ
আর কিছু নয়, তুমি যাও—
আমি একা শিকড় সন্ধানে যাব
বৃক্ষের ছায়ায় ;
খুব স্নিগ্ধ জলে হাত ধুয়ে
তুলে নেব রক্ত কুমুদ ঃ
আর কিছু নয়, তুমি যাও—
আমি একা বৃক্ষের শিকড়ে যাব।

শুভমুক্তি

নগেন্দ্র কুমার মিত্রমজুমদার

মরমে মরমে যে ব্যথা বেদনা জাগে
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মুক্তির স্বাদ মাগে
জীবনের গতি চলমান গতায়তে
পিচ্ছিলময় অতি সংকট পথে
শুধু জাল বোনা টানা ভরলার গুঁজি
ক্ষণিকে সত্যি ক্ষণিকেই ভুল বুঝি
মরীচিকাময় ভুলে ভরা হৃদয়ের
কোথা যোগ শিখা মুক্তি সে আলোকের
অস্বচ্ছতার মাঝে স্বচ্ছতা খুঁজি
প্রতি মুহূর্তে চলে তারি যোঝাযুঝি
জয়ের চিহ্ন কোথা সে পতাকা ঢাকা
সমন্বয়ের সত্যের টিকা আঁকা
বৃথায় কি হবে তার পথ চেয়ে থাকা
শুভ মুক্তির কবে সে ঘুরিবে চাকা

শিক্ষা দাও

টোকন কুমার মহাপাত্র

কর আশীর্বাদ মাগো
তোমারই চরণে আমি
যা চাহিব ভিক্ষা
দিওনা ফিরায়ে মাগো
জগতের কাজে তুমি
দিও মোরে দীক্ষা
চাহিনা বিষয় ধন
চাহিনা মণি কাঞ্চন
চাহিনা গো মুক্তি মা
দিও মোরে শিক্ষা।
দীক্ষার মন্ত্রে মা অমৃত সন্তানে
ত্যাগ ও আশিষ দিও
চাহি এই ভিক্ষা।
জগতের কাজে তুমি
দিও মোরে দীক্ষা ॥

কবিতাকে চেয়ে

অনিতা চট্টোপাধ্যায়

কবিতা কে ডেকে ফেরে মাটি
সারা তার মেলে
বাধার পাহাড় জমে ওঠে
ভেদ করা কষ্টকর হয়
তবু
কবিতা কে ডেকে ডেকে মাটি হয় কুটি কাটা শুধু
ঝড় ঝাপটা আসে মাঠে দারুণ দাপটে
চলে যায় তছনচ করে দিয়ে শিল্পের অন্দর
তবু
জীবনের গান পায় জীবনেরই মাঝে
সুর হয়ে চলে যায়
সুদূরে সুদূরে
আকাশের অন্তর মহলে ॥

সুন্দর তুমি থাকো

প্রলয় মজুমদার

আনন্দের সমারোহ, ফুল-চাঁদ-নদী-বন
এই ভুবনের মাঝে মনে যে হর্ষধ্বনি ভাসে
পরমুহূর্তেই মনে পড়ে যায় হিরোশিমা
নাগাসাকির সেই বিভৎস কেলেঙ্কারি
আহা ! কত অসহায় শহীদ হয়ে গেছে ।

কিন্তু কেন ? কিসের জন্য সভ্যতার
পৃথিবীতে আজোও চলেছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা
ফুলে-ফলে-রূপে-রসে সুন্দর বসুন্ধরা
ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র । এরা কারা ?

আসুন হিংসা, দ্বেষ, ক্ষোভ ভুলে গিয়ে
একসাথে হাত ধরে মধুর কথা বলি
আমরা মানুষ, তাই মানবিকতায়
পৃথিবী বাঁচিয়ে রাখবো চিরকাল ।
হঠিয়ে দেবো ওই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ।

রাত্রির ব্যথা

ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী

চাঁদ আছে চেয়ে সরসীর পানে,
উদাস নয়নে।
ঢেউয়ের ঘোমটা টানি
সরসী লজ্জানম্র মুখে,
জানাইছে তারে যেন,
প্রেম আলিঙ্গন।
নীল আকাশের মাঝে চাতক যাচিছে জল ;
দুচোখ বাহিয়া তার ঝরিছে অশ্রু বসুন্ধরাতে ॥
দূরে ঐ শালবনে করুণ বাঁশির সুরে
কে যেন ডাকিছে তার হারানো প্রিয়ারে ॥
শোকাতুরা জননী হারায়ে নিজ সন্তানেরে
কাঁদিছে আকুল নয়নে।
রাত্রি নিবিড় হয়, কখন অন্য মনে
ভুলাইতে ব্যথা তার,
নিদ্রাদেবী ঢলিছে তার দুটি আঁখিতে।

ভাল-মন্দ

রামানন্দ সাও

ভাল—মানুষের হিতের জন্য
যা কিছু করা হয়
তার সবটাই ভাল।

মন্দ—মানুষের অহিত কর
কাজের সবটাই মন্দ।

অতএব—ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত
মানুষের হিতকর কাজের
কিছুটা হবে' মন্দ
কিছুটা হবে' ভাল।

তাই—ভাল-মন্দ বিচার না করে
কোমর কষে এখন
করছি কাজ নিরলসে।

কারণ—ভাল আর মন্দের মিলনেই
সদা জ্বলে উজ্বল·আলো।

বংশধর

কল্যাণ কুমার বৈতালিক

ভোরের লোহিত কণা
তোমার গর্ভে রেখে
আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত কেউ,
সূর্য্য ওঠার আগে ঘুম না ভাঙুক ;
ভাঙ্গে যদি কান পেতে শোনো—
দূরে কুক্কুরীর ডাক্
ভক্ ভক্ ভক্ ভৌ ।
ভয় পেয়ে দেখ যদি কেউ নেই
মনে মনে ভাবতো একবার ;
আমি আছি তোমার মধ্যেই
ভয় দূর হয়েছে কি এবার !
এই স্বপ্ন নিয়ে সোনালী হোক্ দিন
মুকুল ধরুক গাছে,
গানের কলিরা জানুক, রঙীন—
ভবিষ্যৎ বংশ আছে ।

যাবো, কে না যাবে

সত্য গুহ

চলে তো যাওয়াই যায়
কে না যাবে
লোহা দিয়ে কেউ মাথা বাঁধিয়ে আসেনি
খনি মুখে চিতা কাঠ ডাকে

ঈশ্বর যার থাকে থাক
আমার এই মাটিটিই আছে
এ মাটির সঙ্গে যার সামান্য সম্বন্ধ আছে
তা-ই আমার মহাপ্রাণ

ঘাসের ভেতর দিয়ে—সোনা ও হীরার
ভেতর দিয়েও আমি চলি ফিরি
সাপ ও সিংহের সঙ্গে
আমার বিরোধ নেই
তবে ইদানিং
কেবল মানুষ দেখলে মারণাস্ত্র ভাবি

প্রতিপায়ে চিতা কাঠ ডাকে
যাবো—যাবো তো হে
তবে কিনা শ্মশানের পরেও তো যেতে হবে
আমাকে হাজার মাইল দূরে

যাবো
কে না যাবে

জীবনের রং

গৌতম কুমার ঝা

জীবনের রং হরেক রকম
কখনও কিংশুক লাল
কখনও নিকষ কালো
সাদা, সবুজ, হলুদ
কিংবা পোড় খাওয়া তামাটে।

জীবনের পথও বড় অদ্ভুত
কখনও প্রখর তাপ
কখনও নরম আলো
অলি গলি রাজপথ
কিংবা বৃষ্টি ভেজা কাদাটে।

জীবনের গতি অংক মানে না
নিঃসঙ্গ অথবা ভীড়ে
কখনও দ্রুত কখনও ঢিমে
সাফল্যে বা বৈফল্যে
শুধু সময়ের পিছু ছোটে।

লাল, কালো, সাদা, সবুজ
দ্রুত, ঢিমে, শান্ত, অশান্ত
যাই হোক জীবনের রূপ
ক্ষণিক আনন্দসভায়
বিশ্বাসে ধ্রুব, সৌন্দর্যে অরূপ।।

সাবাস হে

তাপস অধিকারী

রক্তমাখা বালক সাবাস তুমি—
দারিদ্র্যের বাজনা বাজিয়ে
আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে দিলে।
আমরা সব গা বাঁচানো মানুষ,

বৃষ্টিতে ভিজবো না, রোদেও পুড়বো না
তুমি রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে
রক্তের হোলি খেলে গেলে
তুমি বলেছিলে—'প্রাণে বাঁচো আগে—'

বুকের হাড় মাংস পুড়িয়ে
নৈঃশব্দে আগুন জেবলে দিলে।
লাভাময় অস্থির গর্জন তুলে
প্রস্তরীভূত সভ্যতার আঁশ খুলে দিলে,
মানুষের বাঁচার ধান্দা বাতলে দিলে
সাবাস হে রক্তমাখা বালক ·

নিঃশব্দ প্রার্থনা

ললিত কুমার মাইতি

নিশিরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় ··
স্বপ্ন দেখি আর ছটফট করি বিছানায়
স্বপ্নটা বড়লোক হওয়ার রাজা হওয়ার।
সারা রাত কেউ কেঁদে কাটায়
এক মুঠো ভাতের জন্যে
কেউ বা স্বপ্ন দেখে রাজা হওয়ার
শোক দুঃখ ক্রমশঃ গড়ায়
দাপিয়ে বেড়ায় রাতের কান্না ··
মাতাল বাতাসের আক্রোশে
জীর্ণ হৃদয় একেবারে চুরমার।
অন্ধকার কেটে সূর্য্য কখন উঠবে—জানা নেই
এক সময় আঁধার কেটে সহজেই ভোর হয়
তবে ভাতের জন্যে নয় রাজা হওয়ার জন্যও নয়
ভোর হয় নিঃসঙ্গ অন্ধকারের নিঃশব্দ প্রার্থনায়।

মধু বর্মন

রাস্তার পাশ দিয়ে দলে দলে জ্যোৎস্নরা চলে গেল
ও পাড়ার পথ ধরে।
বসন্ত সেনারা-হেনা, জুই-চামেলী
চম্পার পিছনে পিছনে ছুটছে
হাজার হাজার বছর ধরে।
অথচ সুখেরা পিছন ফিরে তাকাল না একবার।
ভালবাসা মানুষের সাথে দেখা করব বলে
সেই যে চলে গেছে কবে
আজও তার দেখা নেই।

এখন প্রেম রা কিছুতেই
ঘিরে আসবে না সবুজমাঠে।

পণ নেবোনা. পণ দেবোনা

পূর্ণিমা মৈত্র (চক্রবর্তী)

পণ নেবোনা পণ দেবোনা
বলরে তরুণ দল
তোদের কথায় সরবে রে আজ
সমাজবুকের পাষান জগদ্দল।
উচ্চকণ্ঠে বলরে তোরা
হব না আর ধনী
পরের ধনে হব না আর
সমাজের সম্মানী।
বল বল বল সবে একসাথে বল
বল তরুণ-তরুণী বল
আমাদেরও আছে শক্তি সাহস, আমাদেরও আছে বল
আমরা নইকো দুর্বল।
হাজার শ্রমের বিনিময়ে মোরা
গড়ব সুখের নীড়
প্রেমের বন্ধনে তারে
করিব সুদৃঢ়।
যদি হই দীন, না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা
নব যুগের তরুণ-তরুণী
আজিকে লয়েছি দীক্ষা।

ঘরে ফেরা

গোপাল চক্রবর্তী

কেউ কি সহজে যেতে চায় !
তবু যেতে হয় ।
যেতে হয় বলেই যাওয়া ;
শুধু দু-চারজন গুছিয়ে সাজিয়ে,
বাকী সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সহসাই ॥

এরি মাঝে কিছু ফুল নিয়ে মালা গাঁথা,
কিছু ভুল নিয়ে জ্বলে মরা,
কারুর সাথে ঘোরা, কারুর পিছে তাড়া
দিনান্তে সরবে অথবা চুপিচুপি
রাতের আঁধারে ঘরে ফেরা ॥

কিছু কিছু কবিতা এবং ভালবাসা

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু কিছু ভালবাসা
সঙ্গোপনে বেড়ে ওঠে—
বুকের গভীরে
শেকড় নামিয়ে যেন অশ্বত্থ গাছ,
যেমন গোপন ঢেউ
নদীর দুপাড় ভাঙে নিজস্ব নিয়মে—
কিছু কিছু প্রিয় শব্দে
কবিতার জন্ম হয়—
বৈশাখী বৃষ্টির মতো
অথবা দারুণ শীতে
উজ্জ্বল রোদ্দুর যেমন
শরীর সচল রাখে উষ্ণ সহবাসে—
কিছু কিছু কবিতা এবং ভালবাসা
নিশ্চিত সুখ দেবে নিরামিষ বয়সে।

কবিতার অভিশাপ

সলিল ভৌমিক

আমরা কেউ কবিতা লিখতে জানি না
তাই কবিতা লেখা মানায় না।
যে কবিতা শুধু রসবোধ জাগায়,
যে কবিতা শুধু আবেগে বা কল্পনায়,
যে কবিতা শুধু সুন্দরের প্রকাশ ঘটায়, ও সত্যের কাছে মাথা নোয়ায়,
তা কখনও কবিতা হয়ে ওঠে না।
নামী দামী কবি যেখানে থেমে গেছে
সেখান থেকে শুরু করতে হবে,
ঋতু পাখীর গান কারো ভালো লাগে না,
কেউ শুনতে চায় না,
আগের মত আমল দেয় না।
যত কিছু অন্যায়, পাপ, মানুষের বাঁচার সংগ্রাম,
প্রকাশ করে জনতার আদালতে দাঁড়াতে হবে,
সকলকে বোঝাতে হবে—
কবিতা শুধু কল্পনা বা আবেগের নয়;
তা না হলে শখের কবিতা একমুঠো জঞ্জাল,
মেহনতী মানুষের হিসেবের বাইরে—
এ কবিতা লেখা আমাদের আর সাজে না।

নির্মোক

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিংভাঙ্গা বাছুরের দলে—
কখন যে ঢুকে পড়েছে সে নিজেই জানে না।
কচি কচি মেয়েগুলো দেখে—
তার আবার খুনসুটি করবার ইচ্ছা জাগে।
চুল! সে তো কালোই আছে;
যদিও রুপোলী রং ধরেছে বেশ কয়েকটাতে।
দাঁতের যন্ত্রনায় ডাক্তার দেখাতে
সে একবার দিনে মার্কেট ঘুরে এসেছে এই সেদিন:
মনটা হঠাৎ-ই কি জানি কেন যে,
ডাংগুলি আর মার্বেল খেলতে চায় রাজপথে।
মুখ ফস্কে কে যেন বলে ফেল্লো কথাটা—
দাদু, তুমি আর চানাচুর খেয়ো না
মাড়ি ক্ষয়ে যাবে। কি লজ্জা! কি লজ্জা!
আবার সে মুখ নামিয়ে ফিরে গেলো একচিল্তে বাসায়।

দুঃখের রঙীন মাছেরা আমার

দিলীপ রায়

হৃদয়ের একাধারে একফালি খোলা বারান্দায়
এ্যাকোরিয়ামে
দুঃখের রঙীন মাছেরা আমার
কী নিষ্পাপ খেলা করে
অবোধ শিশুর মতন

নানা রঙে রঙীন মাছেরা আমার
কল্ কল্ ছল্ ছল্
জল কেটে কেটে
ক্লান্ত হলে
অবশেষে মুখ গোঁজে
অভিমানী শ্যাওলার
সবুজে সবুজে

সুখের লাল আলোটা জ্বাললেই
বড্ড অস্থির, চঞ্চল হয়ে ওঠে,
উৎকর্ণ হয়ে কাত পাতে
সুরম্য কাঁচের দেয়ালে দেয়ালে
কাচ ভেঙে সব
হুড়মুড়িয়ে বেড়িয়ে আসতে চায়
কিন্তু না পেরে
কখনও বা
চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়ে
স্বচ্ছ রঙীন জলের
সুনিথর শ্যামল শীতলতায় (চাদরে)

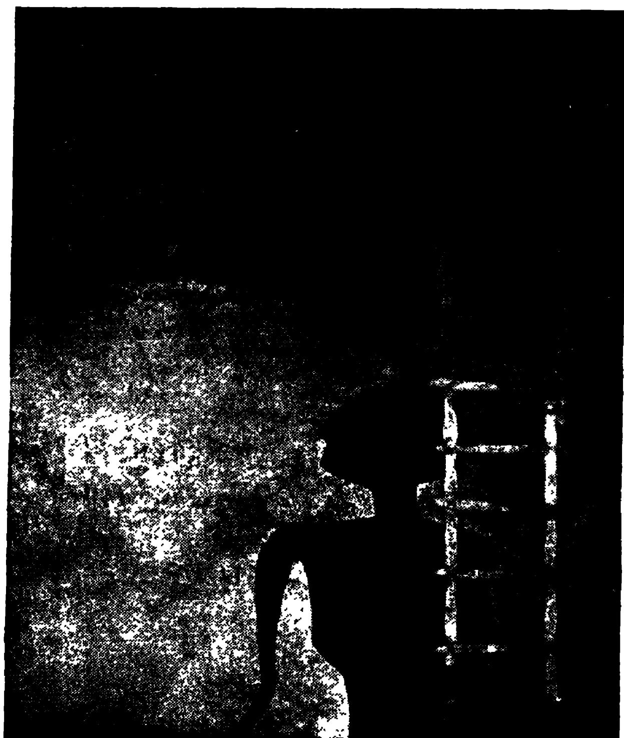
সব দেখে শুনে
আমার কান্না পায়—
বিগত যৌবনা বয়স্কা এক
নাবালিকার মতো।

রক্তিম স্থাবর

সৈয়দ ইয়াসীর আরাফাত

আজ মহড়া দেব ভেবেছি,
দুর্গের তল্লাটে গড়্ফাদার আসবে।
আদিম প্রবৃত্তি, জিঘাংসা চেঞ্জ করেছে।
জেনে নেবে কিভাবে,
চাপা চাপা নীরবতা, নদীর সাথে কথা হবে।
এত একাকিত্ব কখনও দেখিনি,
মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে কান ও বুকের পাটাতন
বারুদ ঠেসে ইটভাটা হয়ে যায়।
আমি পাগল হয়ে যাব না তো!
শুধু একবার, শুধু একবার, হাত বোলাব
শান্ত্রীর চোখের সামনে দুর্গের গ্রানাইট পাথরে।





মডেল

জহর মিশ্র

বয়সের ভারে নয়, ছলনার গল্পে, শূন্যতার গল্পে
নুয়ে পড়ে শতাব্দী
যতই পা চালাও, ছাইবর্ণ পথ আগে আগে তোমার
স্বভাবে বাড়ে না বৃক্ষ, জোয়ারে নদী
শর্তহীন এক-একটি দশক
চলে যায় এভাবে শুধুই
দূরে, বহুদূরে, জীবনের থেকে……

এভাবেই ক্ষয়ে যায় সবুজ রঙের রোদ
ছলনার গল্পে, শূন্যতার গল্পে
ছোট হতে থাকে ভীষণ
মানুষের পৃথিবী
প্রজন্মের জন্য থাকে শুধুই
মানুষের মডেল।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ

অভ্র মুখোপাধ্যায়

কুয়াশা ঢেকে দিয়েছে, অসহ্য চাপা গোঙানি।
পুঞ্জিভূত অসন্তোষের দানায়, নিছক খেলাঘরের শরাসন।
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে—এদিক—ওদিক—সমস্ত দিকে।
হরিণঘাটার দুধ দেবার সময় থেকে, কালোবাজারীদের সঙ্গে পর্যন্ত।
সেই একই কথা—
এটা আমার, ওটা তোমার—এক নই কেউ মোরা।
আজ এটা ভাগ করি, কাল ওটা—
পরশু মাকে ভাগ করার জন্যে—
ভাইয়ের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করি।

অন্ধকারতো থাকবে চিরকাল।
কিসের জন্যে এই ব্যাকুলতা
আলোর দরকার কি ?
ঐ জীবাণু সমন্বিত, মানবতা দগ্ধ তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে
কর বর্জন, এগিয়ে যাও অন্ধকার পানে—
যা এক নিরবচ্ছিন্ন অযযুভূত আনন্দ করে দান।
সে তো কাঙ্খিত,
তাহলে সে কেবল বর্জিত হয় কেন ?

মৃত্যু তো অবিসংবাদী নায়ক।
মৃত্যু মানে তো, ঐ আকাশের একটি নক্ষত্র হওয়া,
নাকি বিলীন হয়ে যাওয়া।
বিলীন ? না তা তো হয় না।
'আবার আসিব ফিরে' এই মনে করেই তো সবাই
ছুটে চলে—ঐ মেকী সুখের প্রান্তে।

তা সত্ত্বেও কেন এই অস্পষ্ট ব্যস্ততা
স্বর্গে যাবার জন্যে, একছত্র রাজত্বে জন্যে।
চলে তো যেতেই হবে—
তাহলে কেন এই অসন্তোষ ?
মুছে ফেল মন থেকে।
যতদিন আছ দুচোখ ভরে দেখ,
দু'হাত ভরে লুটে নাও—জীবনে চলার অফুরন্ত প্রেরণা।
ভোগ করে নাও প্রিয়াকে।
কেন নিশীথ আঘাতে তার—কোনো অভিমান ক্ষোভের
কান্না শোনা যায় ?
পার না শান্ত করতে তাকে ?

ভুলে যেও না ঐ মেকী নেতাদের কথায়।
ওরা জীবনে সমস্যা বাড়িয়েই যাবে,
রাখবার ধারে কাছে যাবে না।
গণতন্ত্রের মুখোশধারী ঐ বুর্জোয়াদের মূলে আঘাত কর।
ঐ সর্বনাশা বিষাক্ত বাড়ন্ত গাছগুলোকে ধ্বংস কর।
নতুবা সমাজের ভালো করার নামে—
খারাপই করে যাবে চিরদিন।

যুগযন্ত্রনা

বিশ্বনাথ চৌধুরী

হাঃ হাঃ করে কারা নারকীয় বীভৎসতায়,
লোভের লেলিহান জিহ্বা—
হিট্‌লার চেঙ্গিস্‌ আর কল্কির কুটিলতা—
উত্তরাধিকার।

পাদ্যার্ঘ্যই হল না
সৎ জীবনযাপনের দুঃসাহস!
ট্রেডিশন ভাঙ্গার দুর্দান্ত হাতিয়ার চাই—
দীর্ঘায়িত হচ্ছে শকুনীমামাদের ছায়া,
ওহে সতীলক্ষ্মী তোমার তো এ গ্রহে থাকার কথা নয়
মিক্‌ গ্যাসের তাড়া খেয়ে পালাবে?
পৃথিবীটা হিট্‌লারের গ্যাস চেম্বার,
গ্রহান্তরে নিশ্চয়ই অনেক যুধিষ্ঠির আছে—
দেখো শান্তি মিছিলে রক্তপাত হয় না যেন!

প্রকৃত মানুষ

গুরুপদ ভট্টাচার্য

ভাল মন্দ উভয়ের দ্বন্দ চিরকাল রবে,
এক অভাবে অন্যজনের অস্তিত্ব লোপ পাবে।
বিচার পর্ব হয় সুষ্ঠ উভয়ে মিলি ভাই,
বাদি বিবাদি এরাই সাজি বিচার চালায়।
জীব জগতে কর্ম তরে এরা জীবের সঙ্গী,
আসলত্ব পায় জীব এদের সঙ্গ ধরি।
হেন ভাব আছে যার ভাল মন্দ দুই,
সেই জন ভাই জন হয় অন্যেরা স্থবীর।
এক অর্থে গুণের কভু না হয় বিচার,
মানবতা থাকে না যেথা সে হয় নাচার।
মানবরূপি সংগ্রামভূমি মানবের ঐ অন্তরে,
ষট্ রিপু লাগি মন ব্যস্ত করে না দ্বিধারে।
মস্তিষ্কের কাজ মস্তিষ্ক করিছে এর অন্যথা নাই,
এই ভাবে মন চলে ভাল মন্দেরে বুঝাই।
বিচারালয়ে বিচার পর্ব যখন হয় শেষ,
আসলত্ব কভু নকল না হবে সে হয় ভবেশ।

দহন

নাগ সেন

মালার আগুনে তুই দু'হাত পোড়ালি
মালার আগুনে তুই দু'চোখ পোড়ালি
বাকিটা পথ কি তোকে মালাই সঙ্গ দেবে

আমি তা জানি না

অসংখ্য গাছের ফুলে একটি মালা হয়
সেই সব ফুলও ফেরে
একদিন নিজস্ব বলয়ে

প্রাথমিক সুতো শুধু একা পড়ে থাকে
আর আমাদের দু'চোখ দু'হাত পোড়ে
অমোঘ টানে তার

রঙীন প্রতীক্ষা

লক্ষ্মী মণ্ডল

জীবনের পথে নেমেছি যখন—
তুমিই আমার সব ; যেতে যদি হয় ;
যাবো দুজনা— ; দূরে—বহুদূরে ;
নীল আকাশের নীচে ; বন্ধুর পথ ;
সমুদ্রের বুকে ভাসব দু-জনা !
কিন্তু এখন নয় ! এখন শুধু
প্রতীক্ষা ; জীবনের প্রতীক্ষা ;
শান্তির প্রতীক্ষা—সুখের প্রতীক্ষা !
এখন তুমি যাও ; বেলা বয়ে যায় !
রাখাল চলেছে গরু নিয়ে গোঠে
ফিরে ; নীড়ের পাখীরা চলেছে
নীড়ে ফিরে !
তুমি আর আমি ; বেদনাতুর মন ;
ভগ্ন-হৃদয় ; সব থাক ; তুমি যাও ।
বিদায়-ক্ষণে থাক শুধু দু-জনার রঙীন প্রতীক্ষা ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

অবনি ভট্টাচার্য

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জগৎ জুড়ে নাম
২৫শে বৈশাখের পুণ্য প্রভাতে তোমায় প্রণাম।
ভারতবাসীর প্রাণপুরুষ ভারতের সম্মান,
পরাধীন ভারত স্বাধীন করতে তব অশেষ অবদান
বিশ্বের দরবারে ভারতের নাম করেছ উজ্জ্বল।
এনেছ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নভেল প্রাইজ
যেখানে মানব জাতি হয়েছ লাঞ্ছিত
তুমি বজ্র কণ্ঠে করেছ প্রতিবাদ তার,
জালিওয়ালাবাগে গণহত্যার প্রতিবাদে নাইট উপাধি করেছ প্রত্যাখ্যান,
হে মহামানব তব জন্মদিনে মোদের এই প্রার্থনা
তুমি দাও শক্তি, দাও প্রেরণা বিশ্বের ইতিহাসে
আমরা ভারতের নাম করিতে পারি উজ্জ্বল।

কঠিন সংযমে

শান্তি মুখোপাধ্যায়

হাসলে তোমরা
আমার ভুল উচ্চারণে ?
কিন্তু তোমাদের হাসিতে
লোকসান নেই আমার
লাভ ছাড়া।
বুঝবে না কেউ এ লাভ লোকসানের গন্ধ
আমি বুঝে গেছি
তোমাদের হাসিতেই
আমার সংশোধন।
তাই বৃথা অভিমানে লুকিয়ে থাকে না
ভালো-মন্দে বেঁচে আছি
কিংবা ধীরে ধীরে আমার সব
মন্দ সরাতে-সরাতে
বুঝতে পারলাম
কঠিন সংযমে
পালটে গেলাম বেশ।

দুচোখের আলোয় শূন্যতা

অজয় চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রের নৈঃশব্দ ভাঙে
        বুকের গভীর·····
গনগনে আঁচে পোড়ে
        স্মৃতির সময়,
বিষন্ন দুচোখ জোড়া
        শস্যহীন মাঠ
কোথায় হারিয়ে যায়
        অতসী আলোয় দেখা
        প্রিয় নীল মুখ।
সত্যকে স্বীকার করে।
        নিষ্ঠার ঋজুতা······
চিন্তার সাবলীল প্রবাহ
        অনুত্তর দিক থেকে ক্রমশঃ
        সুদক্ষিণ দিগন্তে পৌঁছায়।

তোমার শরীর শুধু

কঙ্কণ সরকার

আমার নিজস্ব সময় গড়িয়ে পড়েছে জলে
জলের মত সহজে সবলে দ্রাবমান

ধাবমান সময়ের মতো যে জীবন
শরীরের জন্ম ও মৃত্যুর আড়ালে

অন্য কথা বলে ; তার প্রতি সহর্মর্মিতায়
আমি খুলে ফেলি গভীর গোপন ভার

সময়ের অহংকার সময়েই থাকে
তোমার শরীর শুধু স্পর্শটুকু পায় !

নারী

মৃণাল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গা যমুনা প্রেম সরোবরে তুমি
লালসার বান অবিরল গতিহীন ;
দ্বারকার আর পাগল কর সে তুমি
রূপে নহে শুধু, কণ্ঠে, সে মধু বান ।

শিল্পী যাদুর মনোরম তুলি টানা
বিস্মিত আর মুগ্ধ করার আশা ;
স্নিগ্ধ কোমল অপরূপ মুখখানা
কিন্তু সে যে, সবার সর্বনাশা !

চাঁদ নিগারিয়া জ্যোৎস্নার রূপ ঢালি
যৌবন তনু ইঙ্গিতে উন্মুখ ;
তুমি তব মন কৌতুক ভরা ডালি
বসন্তে যেন সর্বদা স্ফীত বুক !

বন উপবনে চঞ্চলা বায়ু সম
নয়নদ্বয় আনি দেয় শিহরণ ;
কবির কাব্যে রচনায় অনুপম
ধন্য তোমার, মর্ত্যেতে আগমন !

সাংসারিক

স্বপন রায়

প্রজাপতি আজ পাপড়ির উপরে
গতিহীন হয়ে বসে থাকে
পৃথিবীর আহ্নিক গতি একদিন
ঝাউবন এনে দেয় ছাদের উপর ।
বেড্টির গরম ধোঁয়া জমানো বরফ গলাতে চেষ্টা করে
মেঠো পথের দু'ধারেও দেখা যায় লাল-নীল ট্রাফিকের আলো

এমনি করেই একদিন মিতব্যয়ী হয়
কিশোর কোকিল আর কিশোরী পাপিয়ার কণ্ঠ
এমনি করেই একদিন
থেমে যায় পায়ের নূপুর
এমন করেই
গোলাপের ডিম্বাশয়ে
নেমে যায় পরাগ-নলিকা ।

আমি আছি

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রক্তের আলপনা দাও।
তোমার আমার শিরা-উপশিরায়
বয়ে চলেছে যে উষ্ণ রক্ত প্রবাহ
তাকে বার করে আনো
ধরণীর ধূলার সাথে মিশিয়ে দাও
রক্তের আখরে লেখ
আমি আছি—আমি ছিলাম—আমি থাকব।
আকাশের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রকে ডেকে বলো
আমি আছি—আমি ছিলাম—আমি থাকব।
মৃত্যু! কে ও? ওতো শেষ কথা নয়।
মৃত্যুকে দেখেছি আমি মাতৃজঠরের উষ্ণতায়
ভ্রূণের আস্তরণে
আবার দেখেছি আমি, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের
উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কেতে।
চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রিয়া মিলন কুঞ্জে
মৃত্যু তো আমার সঙ্গেই ছিল।
জন্মমৃত্যুর আবর্তনে আমি আসি—আমি যাই
বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ আনে
সূর্যোদয়ের রঙীন আশ্বাস।
উত্তুঙ্গ পর্বত শৃঙ্গে আমি হিমবাহ
দুস্তর মরু প্রান্তরে বালুকণা
নির্জন সমুদ্র সৈকতে তরঙ্গ ঝংকার
আমি আছি!
রক্তের আখরে লেখ—
আমি আছি—আমি ছিলাম—আমি থাকব।

ফরমায়েসী

শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

এক লাইনে হয়েছি মোরা সবাই হেথায় এক
দুয়ের ঘরে শূন্য দিয়ে সবাই চিচিং ফাঁক।
তিন লাইনে বেজায় মরা শান্তিবাহী সেনা
চার লাইনের অন্ধকারে সবাই মোদের চেনা।
পাঁচ লাইনে পাঞ্চজন্য কৃষাণ-শ্রমিক দাগে
ছয় লাইনে চলব মোরা সেই পরাধীন রাগে।
সাত লাইনে সপ্ত সেনা হটছে পিছু নিত্য
আট লাইনে 'অষ্টরম্ভা' আকাশ ছোঁয়া বিত্ত।
নয় লাইনে মগ্ন নব এদেশ মোদের নয়
দশ লাইনে 'বুল ফাইটার' আপন ঘরেই ক্ষয়।
এগারোতে একের দাবী শ্বেত সরিষার ফুলে
বারোর ঘরে সারছি শপথ সব পেয়েছির ভুলে।
তেরোর পরে মস্ত মাতন চারদিকেতেই তিন
চৌদ্দ বলে চৌমাথাতেই নাচো তা-ধিনু-ধিনু।

কোথা গেলে

অশোক কুমার রায়

বন্ধু বলতে পার ?
কোথা গেলে পাবো আমি ভালোবাসার নদী
কোন্ সে পথে, কত দূরে
জলে যার নেই কোন
অশান্ত স্রোত, নেই কোন উষ্ণতা
নির্জন বালুচরে
খেলা করে মনের সারস সুখে।

বলতে পারলে না তো
জানতাম আমি। আজ
আমিও পারিনি।
চতুর্দিকে ভীষণ দুর্যোগ—স্বার্থপরতার, আর
নির্বিঘ্ন নয় পথে চলা। তাই

খুঁজতে এসে ভালবাসার নদী
থেমেছি এখানে
হাতে নিয়ে তুলি আর রঙ, ছবি আঁকব বলে
স্বার্থের আগুনে পোড়া
মানুষের ছবি।

আর কভু চলিব না

ভারতীরঞ্জন নিত্যগোপাল সামন্ত

আর কভু চলিব না ধরণীর প'রে
আজিকার মত,
তাই ভাবি মনে সাঙ্গ করি ল'ব
নিত্য অবিরত—
আপনার কাজ। পরহিত মহামন্ত্র
এ জীবনভোর সঞ্জীবিত করি তন্ত্র—
মোর, দিক্ টান কর্তব্যের পথে
নিষ্ঠাসনে বাঁধি সেবা ব্রতে।
ভ্রষ্ট যেন নাহি হই
অবহেলি দিবসের দান;
আঁধার রয়েছে পিছে—আর আসিব না
শ্রেষ্ঠ বর্তমান।

(অজ্ঞাতনামা কোন এক ইংরাজ কবির—I shall not Pass thi's way again-এর অনুবাদ।)

এই শ্রাবণের ভিতর দিয়ে

(বিশ্বকবির ১২৫তম জন্মবর্ষে)

আশুতোষ দাশ

আমার নিজস্ব কিছু অমেয় শান্তি ছড়ানো
স্রোতী বাইশে শ্রাবণে আর দগ্ধ বৈশাখে।
গ্রামীণ কিছু শাকান্নভোজী বিলাসী, গল্পের
মতন শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরা দেখে
মন টানে একান্তে ভালোলাগা কিছু সংগীতে
মরিচীকা হয়ে যদি মিলিয়ে যেতে পারি।
সান্দ্র নীল আকাশের তারায় তারায়
কবিতার শরীরি সচেতনতা
মানুষের মধ্যবিত্তের নগ্ন মনে শীতল প্রলেপ।
আধ্যাত্মিক কৌলিন্যে এলাহি ভরসা।
লোকগীতিকায় অক্লান্ত বাউল।
ছন্দে শরৎ সুন্দর নির্মোহ জীবন।
আমার চূড়ান্ত অবাধ্যতায়, বৈশাখের শীতল আগুন
এখনও দিক কেটে নিয়ে আসে সরল শ্রাবণে।

দুঃখ হ'তে সুখ

কুমুদ চক্রবর্তী

সাজানো ভবিষ্যৎ কোথায় চলে যায়
অন্ধকারে একা কেঁদে হায়।
ব্যথাতুরের ব্যথা কেউ বোঝে না।
সাহারার তৃষ্ণা কেউ জানে না।
নদীর কান্না তাই কেউ শোনে না।
দুঃখীর শত জ্বালা কেউ মানে না।
অবাক পৃথিবী ঘোরে নিজ পথে।
সকলে নিজ দুখে, দহে অবনীতে।
এভাবে জীবন একদিন শেষ হ'বে
সকলের অগোচরে সকলি ঢাকা র'বে।
চাঁদের আলো পানে চাইবে না আর
আপন আঁধার মাঝে কাঁদবে না হাহাকার।
মৃত্যু এলে পরে পেয়ে যাবে সুখ
স্বর্গের দ্বারে গিয়ে দেখবে সে
আরাধ্য দেবতার মুখ।

নরকে

হৃষীকেশ মাইতি

তোমার সঙ্গে দেখা হবে কবে ?   হয়তো বাসরে—
এই দেখা শেষ তবে দেখবে রাতে অন্য প্রেমিকেরে
আমার চোখ বেঁধেছিল তোমার ঠোঁটের হাসির আয়ত পলকে
দেখিয়েছিলে ঐ লোভী নিটোল বুকের মসৃণ মাংসপিণ্ড
ভালবাসা ছিল ভুলে যাবে তুমি কিন্তু নিজেকে লুকোবে একদিন
আমার চোখ-মুখের স্মৃতিকে কেবলই মনে হবে কি ঘৃণিত পাপ
মনে হবে বাসরের সেই নূতন প্রেমিক
        নিভৃত রাতে ঠোঁটে ঠোঁট মেলাবে
তবু আমাকে দিলে না তোমার সেই যৌন-মধু ও উত্তাপ
এবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে কবে—হয়তো শেষ নরকে—
সৃষ্টির অধিকর্ত্তা মোর ললাটে কাটেনি দাগ —সঙ্গমের চির সুখ
দিয়েছে দূর থেকে তোমার স্মৃতিকে উপভোগ করতে
        তবে অপ্রত্যাশিত ভাবে
কিন্তু তোমাকে রেখে যাব
আমার সেই হিজিবিজি টানা বহু আকাঙ্ক্ষিত উপন্যাসের পাতায়
তবে শেষ দেখা হবে ঐ নরকে ।।

ছেঁড়া ইতিহাস

রণজিৎ কুমার পাত্র

এই পৃথিবীতে এলাম দেখলাম
জয় করলাম, এইতো ছেঁড়া ইতিহাস।
দেখি এখানে খরা-বন্যা, মহামারী,
পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ, দক্ষিণ আফ্রিকায়
অশ্বেতকায় রাষ্ট্রের উপর শ্বেতকায় প্রিটোরিয়া
সরকারের নির্লজ্জ আক্রমণ, নিকারোগুয়ায় যুদ্ধ
বৃহতে বৃহতে দম্ভের লড়াই — ষ্টার ওয়ার।

দেখি ক্ষুধার বিরুদ্ধে মিছিল, মিছিল
দূষণের বিরুদ্ধে—মিছিল শান্তির জন্য।
সবই বিংশ শতাব্দীর ছেঁড়া ইতিহাস।
চাইনা এ পৃথিবী এ ইতিহাস।
ফিরে যেতে চাই সুদূর তপোবনে—যেখানে
বিরাজিত শান্ত স্নিগ্ধতা। দেখবো শিশুর মুখে
মায়ের উন্মোচিত স্তন।

বারোটার পর

দিশারী মুখোপাধ্যায়

যতক্ষণ না বারোটা বাজে ততক্ষণ সবাই,
তারপর একে একে অন্তর্ধান।
কেউ দ্রুত কেউ ধীরে কেউ হেসে
কেউ কেউ অনুমতি নিয়ে।

তারপর একা
দিক্ শূন্য প্রান্তরের বুকে কোনো গুল্মের মত,
অথবা বাদামী এক অরণ্যের বুকে
হারালে যেমন হয় শহুরে কিশোর।

তখন সে একাকিত্ব
ভয়ের প্রেতাত্মা আর
কল্পনার অসংখ্য মরণ। তবু,
বুকের ভেতর থেকে বাদুড়ের নিশ্ছিদ্র ত্রিপল
অন্ধকারে মেলে ধরে মিলেমিশে যাই,
ঘরে ফিরি অর্জিত প্রত্যয়ে।

জ্যোতির্ময় হুই

রাত্রি কত হলো ?
প্রশ্নের উত্তর নেই,
উত্তর নেই আরো অনেক প্রশ্নের ।
সারা জীবনের শ্রান্তি আর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে-পড়া
এক মানুষের বোবা কান্না !
বিনিদ্র রাত্রি-নির্দয় নির্বাক সাক্ষী,
শূন্য পাথের মানুষটার বুকের জ্বালা-যন্ত্রণা
অনুভব করে মূক পাথর হয়ে আছে ।
সমাজের কাছে, পৃথিবীর কাছে মানুষটার
অনেক, অনেক কাজ ছিল একদিন,
অগণিত ছাত্রের কাছে তার প্রতিষ্ঠা ছিল,
গভীর মমত্ব. ত্যাগ, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতায়
সে গড়ে তুলেছিল তার স্বপ্নের ইমারৎ ।
শরীরের শেষ রক্তবিন্দু, হৃদয়ের সর্বশেষ নির্যাস
আর তার তারুণ্যের সব, সব জীবনীশক্তি
নিঃশেষিত হয়েছে জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে ।
একদিন যে স্বরযন্ত্র উদ্দীপ্ত হতো
মানুষ গড়ার কাহিনী শোনাতে,
পাঠ্যের ভাষ্য নিয়ে যা ছিল বাঙময়,
জ্ঞানগর্ভ প্রতিটি শব্দ যার থেকে অগণিত ছাত্রের
ভবিষ্যৎ পাথেয় দানে ছিল মুখর,
আজ নিষ্ঠুর, নির্মম নিয়তির পরিহাসে
তা দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ।

সমাজ তাকে ভুলে গেলেও,
দেশ তার ত্যাগের কথা মনে না রাখলেও

দূষিত ভাইরাসগুলো কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়,
পরম সোহাগে জড়িয়ে ধরেছে তাকে,
নিঃশোষিত প্রায় মানুষটার নীরক্ত দেহে
পরিতৃপ্ত তারা বংশবৃদ্ধি করে চলে।

চিকিৎসা ?   কে দেবে অর্থ ?   কে নেবে সংসারের ভার ?
দুর্ভাগ্য শোষিত মানুষটা আজ শুধু
প্রশ্ন আর প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সমস্যা-জর্জর।
অবসরের আর দেরী নেই।
অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যৎটার কি নিষ্ঠুর চাহনি !
না, ভয় নেই, মৃত্যু দুয়ারে ঐ !

তোমরা শুধু জাঁক করে একটা শোকসভা করো,
অভিধান থেকে ভালো ভালো শব্দগুলো খুঁজে রেখো,
শোকসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে
আরো অনেক কিছু করবে জানি—
আমার একটা কথা শোনো,
সত্যিকার একফোঁটা চোখের জল ফেলো
সত্যিকার মানুষ-গড়ার সেই কারিগরের
তাই হবে সর্বশেষ আর সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া।

মিছিল

শক্তিপদ রায়

তেরশো শ্রমিক বেকার হলো,
বন্ধ হলো চটকল।
বোঝার উপর শাকের আঁটি
এমনি গেঁড়াকল।

ঘরে ঘরে হাজার বেকার—
কেউ নেইকো এদের দেখার
মদ ভাঙ্‌ আর চণ্ডু চরস্‌
চলছে অবিরল।

এমন একটি নেইকো যে ঘর
যে বোঝেনা এদের কদর
শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের
কাঁদে শ্রমিক, কাঁদে বেকার, কাঁদে দেশের লোক,
ধনতন্ত্র নিপাত যাক, বেকারী দূর হোক।

ক্ষমা

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

অবনত গুরুভারে দণ্ডগ্রাহী পাপাচারীগণ
ন্যুব্জ পৃষ্ঠে শ্লথ পদে সারি বেঁধে পথ চলে তবু ;
তাহাদের দলে চলে ক্রুশস্কন্ধে খৃষ্ট মহাপ্রভু—
পথিপার্শ্বে, প্রাঙ্গনে, প্রান্তরে, দ্বারে দর্শী অগণন ।
কৌতুহলী জনতার ক্ষমাহীন ধিক্কার-লাঞ্ছনে
মৃত্যুযাত্রী দণ্ডিতেরা ম্লান মুখে চলে বধ্যভূমে :
ঢিল ছোড়ে কোনো মূঢ় খৃষ্ট প্রতি ; বর-অঙ্গ চুমে'
পুণ্য হয় লোষ্ট্রশিলা, আপনারে ধন্য মানে মনে ।

দু' পাশে দু' বাহু সহ পেরেকেতে বিদ্ধ পা' দু'খানি
উচ্ছ্বসিত রক্তস্নানে সিক্ত করে ক্রুশ-কাষ্ঠ দীন,
প্রাণ গলে' নিম্নে নামে বেদনাক্ত শোণিতের ধারে ;
ঊর্ধ্বে ধায় ক্ষীণ কণ্ঠে অকল্পিত প্রার্থনার বাণী—
"ক্ষমা করো ওগো পিতঃ, অবিমৃষ্যের কার্য অর্বাচীন,
ক্ষমা করো হে বিধাতঃ, অজ্ঞানের নিষ্ঠুর ব্যাভারে ।"

পাতা

মধু রাজোয়ার

দিন বয়স বাড়িয়ে ঝরে যায়
নতুন পাতার মত আবার জাগে
ক্রমশঃ টুকরো টুকরো পত্র পাঠ,
এগুলো একটা একটা জীবন পাতা
ধীরে ধীরে আয়ু ক্ষয় করে।
দুপাতার মাঝে কালো আঁধার
যেখানে শুয়ে বসে সাময়িক স্বস্তি।
রবির সাথে আমাদেরও জাগা
নতুন উদ্যম, কত আশা—
কর্মের সাথে বোঝাপড়া
হর্ষ বিষাদের দিনগুলোর বুকে।
গোধূলি বেলায় ঘরে ফেরার পালা
কালবৈশাখীর উত্তপ্ত ঝড়ে
পত্রহীন হয়ে শেষে নুইয়ে পড়া।

সুখের টানে

অশোক কুমার দাস

ভাল লাগে বলেই
বার বার ছুটে আসি
তোমার কাছে
তোমার কাছ থেকে চরম প্রত্যাখান পেয়েও
আমি কিন্তু কোনরকম উচ্ছৃংখল হয়নি
পরন্তু আগের মতোই স্নেহমমতার দৃষ্টি নিয়ে
তোমার কাছে যাই।
এই উৎকণ্ঠা, এই ব্যাকুলতা, ভালবাসাবাসি
সবই এক স্বপ্নের মায়াজাল
তুমি হয়তো দূরে সরিয়ে রাখতে চাও আমাকে
তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই
বরং তোমার কথা ভেবে আরো—
নিবিড় করে ধরে রাখতে চাই
হৃদয়ের অনুভূতিতে।
হয়তো বা তোমার জন্য প্রতিটি মূহূর্ত ভরিয়ে রাখবো
সুখ প্রত্যাশার কাছে
এক নতুন সুখ স্বপ্নের স্মৃতিতে।

মুক্তি

মদন গোপাল গোস্বামী

হয় তো আর নেই
চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে
দিগন্ত থেকে দিগন্তে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াটে সামিয়ানা।
তার নীচে ঘিরে রেখেছে
ঐ অশরীরী প্রেতাত্মাগুলি।
যার নিঃশ্বাসে অশুভ মৃত্যুর সংকেত,
আমরা বাঁচতে চাই
অন্ততঃ প্রেতশীলায় কয়েকটা পিণ্ড।
উৎসর্গে, ওদের মুক্তি, মুক্তি আমাদের,
যদি সন্ধানে থাকে সেই পরিত্রাতার
গয়া প্যাসেঞ্জারে টিকিট কিন্তু কাটা।

স্বপ্নে সোনার হরিণ

উত্তম কুমার দেবনাথ

ছুটন্ত সময়ের দুরন্ত দানবের পিঠে চেপে
উড়ন্ত সওয়ার উদ্‌ভ্রান্ত যদিও দুর্বার বেগে ধায়।
নিষ্পাপ শৈশব, উন্মন কৈশোর, আর সৃষ্টি ছাড়া দুর্দম যৌবন
একে একে পেরোয় আদর্শ আর মূল্যবোধের সমস্ত জংশন ॥

মন্থর চলার দিন জোর করে দূর হটিয়ে
কচ্ছপে জুড়েছি আজ বেসামাল কুরঙ্গ গতি।
বিজ্ঞান-বলে পেয়েছি বেগ, হারিয়েছি আবেগ,
বিবেকের লাগাম ছিঁড়েছে, বাড়ছে নিত্য অনিশ্চিত উদ্বেগ ॥

শরতে প্রকৃতি

স্বপ্না সোম

আজি এ শরৎ প্রভাতে
প্রকৃতি কেমন সাজিয়াছে দেখো
অরুণ আলোক মালাতে
শ্যামলা বসন পরি
রুণু ঝুনু ঝুনু বাজায়ে সে মল
নেচে চলে আহামরি
সর্ব অঙ্গে বিরাজিছে তার
শেফালি মালতি কত
ললাটে শোভিছে শিশির বিন্দু
মুক্তা দানার মত
শরৎরানী হস্তে যে তার
সোনার কমল লয়ে
এনেছে তিনি সবাকার তরে,
খুশির বারতা ব'য়ে
যেদিকে তাকাই দেখি যে শুধুই
সবুজের সমারোহ
যেন উজাড় করিয়া প্রকৃতি দেবি
ঢেলে দিয়াছেন স্নেহ
নীল গগনে ভাসিয়া বেড়ায়
শুভ্র মেঘের ভেলা
কখনো আবার মেঘ ও রোদের
চলে লুকোচুরি খেলা
এক আধ পশলা বৃষ্টিধারা
ঝরে যায় মাঝে মাঝে
সোনালি রোদ হেসে ওঠে পুনঃ

আপন খুশ মেজাজে
শুভ্র কাশের গুচ্ছ
হালকা হাওয়ার দোলনায় চ'ড়ে
খাচ্ছে খুশিতে দোল
পালখানি তুলে, গায় প্রাণখুলে
তরি বেয়ে চলে মাঝি
যেন. তার পরাণেও লেগেছে হঠাৎ
খুশির হিল্লোল।
চৌদিকেতে পুজোর আমেজ
ফুলের মিষ্টি গন্ধ
সবার মনেই খুশির বাতাস
বইছে মৃদু মন্দ
স্নিগ্ধ, শ্যামল শরৎ ঋতু
রূপ, লাবণ্যে ভরা
ধন-ধান্যে. পুষ্প-পত্রে
ছেয়ে গেছে এই ধরা
শরৎকালে প্রকৃতি দেবীর
রূপের সীমা নাই
হেরি, তৃষিত নয়নে এ রূপ মাধুরীর
মুগ্ধ হইয়া যাই ॥




PRODIP

পরিব্রাজকের বেশে প্রেম

দিলীপ কুমার দত্ত

প্রেম ঘুরে ঘুরে আসে
পরিব্রাজকের বেশে
বসন্ত ঋতুসম নব নব সাজে
আমায় নিয়ে চলে
ধানসিঁড়িটির পাশে।

প্রেম ঘুরে ঘুরে আসে
পরিব্রাজকের বেশে
আমায় নিয়ে চলে
সবুজ অরণ্যের ধারে
কোনো অজানা-অচেনা
মানুষের কাছে।

প্রেম ঘুরে ঘুরে আসে
পরিব্রাজকের বেশে
আমায় নিয়ে চলে
উড়ন্ত মেঘের কাছে
আপন বিরহ-ব্যথা পৌঁছে দিতে
যে আমার পথ চেয়ে আছে।

ঝরা পাতা

মধুমিতা দাশগুপ্তা

উজ্জ্বল আলোর দিন নিভিয়ে দিয়ে
হেমন্তের ঝরা পাতার মতো ঝ'রে যাবো একদিন।
সময়ের হাত এসে মুছে দিয়ে যাবে সবকিছু।
যখন চড়ুই-এর দল টুকুস্ টুকুস্ শব্দ তোলে উঠোনের ধারে,
লাল লাল বটের পাতায় নেমে আসে সন্ধ্যার ক্লান্ত নীরবতা,
তখন আমায় যদি না পাও খুঁজে সবুজ-ফসল-ছাওয়া মাঠে—
ভৈরবীর প্রসন্ন সকালে জেনো আমি মিশে আছি
অপরাজিতার নীলে।
আমার অন্তহীন প্রতীক্ষার নদী
যদি মিশে যায় ধূসর শূন্যতার বুকে.
তোমার আকাঙ্ক্ষার তার বীণার তারের মতো
কেঁপে কেঁপে যায় যদি ছিঁড়ে।
সেদিন আমায় যদি না পাও খুঁজে,
শীতের স্বপ্নিল উষ্ণতার পরশে, শ্রাবণের নরম নিবিড় ছন্দে—
জেনো আমি মৃত্যুরে ডেকেছি শুধু তোমারি নাম ধরে।

সু. তোমার শুভেচ্ছার উত্তরে

অমিত কর্মকার

তোমাদের শুভেচ্ছাগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছি আমি
নিতে নিতে বয়স অনেক হল
আমি খেয়াল করিনি। সু,
তোমাদের পাহাড়ে তোমাদের সবুজ শহরে আমার
যাবার বহু সখ
তোমাদের কুয়াশার শহরকে আমি স্বপ্নে দেখি
প্রতিদিন,
তোমার বিষণ্ণ খোলা চুল
আর শীতল আঙুল আমার ঘর্মাক্ত মুখ ছুঁয়ে যায়
ছুঁয়ে যায়
আমি, প্রতিনিয়ত ঋতুর যাওয়া আসার মাঝে
তোমাদের প্রতীক্ষিত মুখগুলি দেখি
শুভেচ্ছা কুড়োই
এবং কখন বয়স বেড়ে যায় খেয়াল রাখিনা।

বিদায়

সিদ্ধার্থ শঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ক্রমশ সবুজ এখানে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে—
বিদায়ের মুহূর্তগুলো হারিয়ে যায়
বিচ্ছেদের তলে।
বন্দরে নৌকাগুলি ভীড় করে আসে
নতুন সব সম্ভাবনা নিয়ে—
কলরবে সাথীদের নিয়ে চলে যায়
দূরান্তরের নীড়ে
পড়ে থাকা মানুষদের
হৃদয়ের পাত্রটিতে
বৃষ্টির ফোঁটার মত
মুহূর্তগুলো ঝরে পড়ে।
স্মৃতির বরফি—
শুধুই কেন গড়ে তোলে মার্বেল প্যালেস ?

ঈশ্বর

অজয় দাশ

একটা নামের বিবর্ণ প্রজনন।
যুগান্তের অশ্রু আর হাহাকারে অভিষিক্ত
রক্তাক্ত পাষাণ পুত্তলিকা
নির্বিকার।
অস্তিত্বের প্রশ্ন বহুকালের,
ব্যর্থ মাথা খোঁড়া, ক্রন্দনের বীভৎসতা ;
চক্ষুর খোঁজার অন্তরালে
এক বহুভাবিত সর্বনাম।

হিংসা অহিংসার দ্বন্দ্বের মাঝামাঝি
হয়তো সর্বকালে জেগে আছে
উন্মীলিত দুটি স্বপ্নমাখা চক্ষু।
রূপ অরূপের বহু দূরে
আছে যদি বিশীর্ণ রূপের প্রগলভতা
হয়তো সেই হবে অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ।

স্বপ্ন দেখি জীবনের

দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

অমাবস্যার কাল রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকার
অতিকায় অজগরের মত সৃষ্টিকে গ্রাস করেছে।
নিশ্ছিদ্র মৃত্যুর মত সে করাল, ভয়ংকর
শ্মশানের বিভৎস স্তব্ধতার মাঝে,
অশান্ত অশরীরি যেন নেচে নেচে ফেরে।
সময়ের গতি অবরুদ্ধ, সৃষ্টির অন্তিম সময় যেন।
হতভাগ্য কবি আমি জেগে আছি একা।
দূর বনানীর দীর্ঘশ্বাস যদি ভেসে আসে,
আশার আশ্বাসবাণী যদি পশে— এই অভীপ্সায়!
এ মহানিদ্রা, ভ্রূকুটি-কুটীল রাত্রে যদি ভেঙ্গে যায়;
দূরে দিগন্ত হ'তে একটি তারকা যদি দিয়ে যায় আলো
মহাসাগরের পুলক বাতাস,
যদি বুক ভরে দিয়ে যায় স্বস্তির নিঃশ্বাস:
মরণের তীরে বসে তাই জীবনের স্বপ্ন দেখি।

পরীরা সব ঘুমিয়ে আছে

রাজা ব্যানার্জী

পরীরা সব ঘুমিয়ে আছে শহরের বাইরে,
সবুজ ঘাসের গালিচাপাতা কবরখানার মাটির তলায়।
দুহাত বাড়িয়ে জানায় আমন্ত্রণ আগ্রহ ভরে
লালপরী, নীলপরী, জর্দাপরী, স্বপ্নপরীর দল।
আশ্রয়হীন পথিকের আশার শান্তিবন
কবরে ঘুমন্ত একাকী।
পরীর হাতের স্পর্শ, ওষ্ঠের চুম্বনের শব্দে
চারিদিকে পরিব্যাপ্ত, বাকিরা সব তৃষ্ণার্ত
স্ট্যাচুর মত সমীচীন হয়। দ্বিতীয় চাঁদের
ভাঙা ভাঙা ম্লান আলোয়, যুগল মিলনের না শেষ হওয়া
গল্প। দীর্ঘপ্রবাসের পরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে
জীবন্মৃত হয়ে,
শুধু একবার স্বপ্নিল পরীর অম্লান হাসি দেখে
ঘুমিয়ে পড়ার জন্য শেষবার মাটির গভীরে।

একান্ত আমার

সুবীর মুখোপাধ্যায়

নিজের অহংকারী অনাবাদী জমি
পরের আবাদী হয়ে ডাকে
'কাছে আয়, চুমো দিয়ে যা !'
তখনই মনে হয়
                    নারী ভালোবাসে
পুরুষের উষ্ণ করতল।

নষ্ট বিকেলে লক্ষস্পর্শা গ্রাস
বিয়ার বুকে নিয়ে ডাকে
'কাছে আয়, চুমো দিয়ে যা !'
তখনই মনে হয়
                    খোয়া গেছে
একান্ত দুর্লভ কিছু।

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখি
তার বুকের গভীরে
আমার উজ্জ্বল মুখ—
                    একান্ত আমার।

ঝড়

আশীষ শর্মা

ঝড়ের পালক উড়ে উড়ে
চোখে মুখে পড়ে
কখনো শাসিয়ে যায় অল্পে
কখনো দুরূহ চাপে ব্যথা ভরে দেয়
তবু যেন নদী হয়ে বয় অন্ধকারে

পালা করে নাচে
ঝড়ের পায়ের সাথে একটা নূপুর বাঁধা আছে

কারো ভয় মোছে কোনো বৃন্তে
শীর্ণ ক্লিষ্ট স্বপ্নে
বৃষ্টির স্মৃতির ক্লান্তিসুখ জড়ো করে,
দাহ চিরে স্বস্তি খোঁজে এদিকে ওদিকে
টানা সবদিকে

উড়ে, ঝড়ে ধুলোবালি ওড়ে
যেন নদী বয় অন্ধকারে।

চাইবে না বরাভয়

সুবীর ঘোষ

বাঁশি না বাজুক লুপ্ত কি তৃণভূমি ?
সোঁতাপথ সাঁকো—কাদার আলতা পায়ে
দু'জোড়া ছাপের যুগল সন্ধিক্ষণে
কেন আর তবে চাইবে না বরাভয় ?

মৃত্যু আমার আবিশ্ব জনতার
কালো মাথা ঠেলে নিঃস্ব নিরুত্তাপে ;
সাঁঝে সন্ধানে বিশ্বাসী চাঁদময়,
সোঁতাপথ তবু চাইবে কি বরাভয় ?

হাজার বছর পরে

প্রদীপ চৌধুরী

হাজার বছর পরে
অন্য কোন গ্রহ থেকে
কোন এক প্রাণী এসে
খুঁজে পেল আমার ফসিল।—
মৃত্তিকার আবরণে
      আমার ভারতবর্ষে।

পাঠালো তাদের গবেষণাগারে।
এলো বৈজ্ঞানিক,
দেখলো আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।
তারপর লিখলো নতুন করে
অতীতের ইতিহাস—
এ পৃথিবীতেও প্রাণী ছিল :
নির্যাতিত !······
তবু তা'রা লড়তে জানতো,
(তাই সমগ্র ফসিলে যন্ত্রণার মানচিত্র !······

শাহবানু

শ্যামলী মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য

হাতের নাগালে আগুন
পিছোনেই পুকুর
পুড়তে পারেনি
ডুবতেও না
বলার ছিলো বোলে·· ···
ঠোঁটে স্বস্তি
চোখে জলোচ্ছ্বাস
সত্যের নেশায়
মদমত্ত মানবী ·····

ইচ্ছা

কালীপদ পাল

বন্ধু, নিজের শব কাঁধে করে কখনো কি হেঁটেছ ?
তোমার সেই শব, যার বুকে ইচ্ছেরা ছিল লুকিয়ে,
সেই শব কাঁধে ফেলে তুমি কি গেছ
বর্ষায় দু'কূল হারানো নদীর তীরে,
ধবধবে জ্যোৎস্নায় স্নান করা নির্জন মাঠে।

যদি গিয়ে থাক—তবে নিশ্চয় তোমার শব তোমার
সঙ্গে কথা বলেছে। বলেছে—'এই নদীতে আমায়
ভাসিয়ে দাও।' বলেছে—'এই মাঠে আমায় কবর দাও।'
কি জবাব দিয়েছ তুমি তার কথার ?
বলেছ কি—'মৃতদের কোনো ইচ্ছা থাকতে নেই।'

আজকের নেতা

কাসেম আলি বিশ্বাস

দেশের কথা উনি বড় ভাবেন,
দেশের জন্য উনি করেন লড়াই,
দেশের দুঃখে উনি রাত্রি জাগেন,
দেশের ব্যথায় চোখে জল গড়ায়।

দশের হিতে উনি জান দিতে চান
যা করেন, করেন নিঃস্বার্থ সবই— ;
হৃদয়ে বয় সদা জীব-প্রেমের বান,
ত্যাগী, মহা-সন্ন্যাসী, উনি মহাকবি।

কেউ কি জানো উনার চালচুলোর খবর ?
মন্দলোকে হয়তো কিছু মন্দ বাক্য বলে ;
উনি আলু-কলাসিদ্ধ অন্ন খান, জবর
কিছু নয়— আখের গুছিয়েছেন কলে কৌশলে।

আমরা মেনেছি উনার সিংহ হুঙ্কার,
রক্তচুষে বাদুড় হোলেন উনি, নাইক অহঙ্কার।

খসে পড়ে

তুষারকান্তি ষন্নিগ্রহী

মাধবীলতার ফুল খসে পড়ে
জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার একটি একটি কুঁড়ি
খসে যায়। শীতের হিমেল হাওয়ায়
খসে পড়ে বনানীর পাতা।
জীবনের আয়ু একটু একটু করে খসে যায়।
খসে পরে মরচে পড়া সেতারের তার
খসে যায় নীল আকাশ, উদার হৃদয়
পাখির পালক। ফুল থেকে খসে যায় রেণু
বাতাসের উত্তালে
মন খসে চলে যায় অন্যলোকে
চলে যায়, হারিয়ে যায় বলেই
বারবার শুনি আগমনীর গান।
সুখের সবুজ হাসি, চোখের চিরন্তন পলক—
কার নতুনের আরাধনা।

রবীন্দ্রনাথ : ওরা কেমন আছে ?

দেবকী পাত্র

ওহে প্রবীণ কবি ! তোমার অমল দাদার
খবর কি ? সুধা আজ বড় হয়ে হয়তো
কার ঘরণী । ঠাকুরদা কি বেঁচে আছেন
তোমার লাবণ্য কেমন আছে ? শোভনলাল
সন্ন্যাসি হলেও ঘরের টান ভোলেনি
তোমার কমলা সাধের ক্যামেলিয়ার
বয়স বেড়েছে । পথে ঘাটে চোখে পড়ে
নিখিলেশ কে পাইনে আজ
সন্দীপন মেলে বর্তমান রাজনীতিতে
দামোদর শেঠে ছেয়ে গেছে বাংলাদেশ ।

তবুও রূপ ঝরে

বিনয়কৃষ্ণ জানা

যদি-বা চাষ নেই,
যদি-বা ঘাস নেই,
তবুও রূপ ঝরে—
আকাশে মেঘ করে,
বন্ধ্যা বালুচরে বকেরা চরে।

যদি-বা লোক নেই,
যদি-বা চোখ নেই,
তবুও রূপ ঝরে—
আকাশে মেঘ করে,
জানি না কার তরে পাহাড় রূপ ধরে

দ্বৈত ভূমিকায়

সন্দীপন বিশ্বাস

দিগন্তের জানালায়
গোল লাল আলোটা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে
ক্রমশঃ অন্ধকার কেটে যায়।
মুখে দ্রুত কসমেটিক্‌স বুলিয়ে
রাত্রি, কালো কাপড়টা পাল্টিয়ে
দিনের সাদা জামা গায়ে
দিব্য সংসারের কাজে লেগে গেল
ব্যস্‌, রাত্রি হল
দিন।
এমনি করেই রোজ একই
নাটক মঞ্চস্থ হয়
আর এই নাটকের পাত্র-পাত্রী একজনই
দিন রাত্রির দ্বৈত ভূমিকায়।

মহাশান্তি

হিমাংশু কুমার মৈত্র

আমি বেশ শান্তিতে আছি।
কিছুদিন আগে কারা যেন
জাতির জনককে মেরেছে গুলি ক'রে,
মেরেছে প্রধানমন্ত্রীকেও।
আমার জনক বহাল তবিয়তে
বেঁচে আছেন এখনও ; জননীও তাই
আমি বেশ শান্তিতে আছি ॥

পাঞ্জাবে তেরজন মরেছে উগ্রপন্থীদের হাতে
জামশেদপুরে বিশজন — সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।
আমাদের এখানে নেই ওসব উটকো ঝামেলা ;
শুধু রাজনীতির দাদারা—এ ওর গলা কেটে
লাশটা লুকিয়ে ফেলে তড়িঘড়ি।
তা—আমি রাজনীতি করি না—
আমি বেশ শান্তিতে আছি ॥

ঘরে আগুন বা ডাকাতিটা অবশ্য
হয় মাঝে মাঝে ; ট্রেণে, ব্যাঙ্কে, ফ্ল্যাটে,
সোনার দোকানে বা প্রতিবেশীর বাড়ীতে।
সেদিন ঠেকাতে গিয়ে, পাইপগানের গুলি
কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল,
গায়ে এতটুকু হ্যাকাও লাগেনি আমার
আমি মহাশান্তিতে আছি ॥

বুমেরাং

সুব্রত জানা

কংকাল করোটি গোত খেয়ে খেয়ে
ক্লান্ত সীমাহীন ধূসরে। নৃশংস্য নোংরামির
জীবনে শেষ উত্তরের চিতা জ্বলছে।
বুমেরাং হয়ে আসা শৃংখলিত আর্ত মানবতা।

ফাগুন ঘেরা গোলাপী বসন্তে
কেউ কি ফেরি করে নিজেকে ?
চন্দ্রালোকের শান্তি অভিমান অশ্রু ঝরায়।
পাহাড়ী ঝরনায় বেজে ওঠে বিপ্লবের সাইরেন।

ঘুমন্ত রক্তে সাহারার প্রতিচ্ছবি দেখেও
উচাটন মন জরি মাথা শাড়ীর গর্তে
শীতঘুম দেয়। করমচা ফুলের সোনালী গন্ধে
তারামাছ আর তারা, আমি আর জোনাকী সব এক।

শিশির ভেজা রজনীগন্ধার শেষ রাতে
বুমেরাং হয় নীল স্বপ্নের পাঁচালী।

কবিতা

মহানন্দ ধর

কবিতা লেখার শখ
মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ
জীবনেরও
তাই এ কল্প-বিলাস
বাজারি প্রেমের বিজ্ঞাপণ
ক্ষত-বিক্ষত 'তাজমহল'
মনের কিছু এলোমেলো কথা
সমকালের প্রশংসা
ধন্য লেখক, কবি
কবিতা।

আজ-কাল-পরশুর ভিতর

অজিত কুমার চক্রবর্তী

আজ গড়েছ ভিত,
কাল হবে দেয়াল। পরশু হবে
ছাদ আর দরজা জানালা
দেয়ালে থাকবে টেরাকোটার কাজ
ছাদ হবে দিলোয়ারা।
সব মিলিয়ে তোমার ইমারত হবে
ইতিহাসের পাতা থেকে নেওয়া
কোন ঐতিহ্যমণ্ডিত সৌধ।
সত্যি বলতে কি,
আমাদের থাকবার কোনও ঠাঁই নেই
আমরা বরং তোমার সৌধের ছায়া
একটু স্পর্শ করবো।

দীপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আশ্বিনের মধুর সন্ধ্যায়
শরতের পুষ্পকাননে
ভিড়িয়াছে যত অলিকুল
পুষ্পের সুধা-অন্বেষণে,
শরতের প্রসন্ন প্রভাতে
যৌবনের প্রচ্ছন্ন শিলাপটে
জাগিয়াছে প্রেয়সীর অভিসার রূপ,
শরতের মানস-কাননে
ভিড়িয়াছে দলে দলে
আশ্বিনের কপোত-কপোতী.
আশ্বিনের বনভূমি 'পরে
উঠিয়াছে বন্দীর হাহাকার রব,
শরতের পূর্ণ খেয়া তরী
ভিড়িয়াছে আশ্বিনের সন্ত খেয়া ঘাটে,
শরতের আনন্দ-উৎসবে
ভিড়িয়াছে দলে দলে শৈশবের কিশোর-কিশোরী,
শরতের মধুর সন্ধ্যায়
জীবনের পূর্ণ পট 'পরে
জাগিয়াছে শৈশবের চঞ্চল স্মৃতি,
আশ্বিনের মধুর সন্ধ্যায়
জ্বলিতেছে মিট্‌মিট্‌ উজ্জ্বল তারা
শরতের সুনীল আকাশে,
শরতের সুনীল সাগরে
উঠিয়াছে আশ্বিনের উত্তাল ঝড়,
শরতের আনন্দ শান্তিময়ী রূপ

জাগিয়াছে জীবনের মুক্ত বালুচরে,
শরতের সুনীল আকাশতলে
আনন্দ-বার্তা লয়ে ভিড়িয়াছে দলে দলে
শরতের ক্ষুদ্র বলাকা।

আশ্বিনের প্রসন্ন প্রভাতে
কোন সে তরুণ বাউল
ঘোষিয়াছে জীবনের বিজয়-বারতা।
আশ্বিনের আনন্দ-কাননে
উঠিয়াছে বিহঙ্গের সুমধুর মুখরিত চির কলরব,
শরতের আনন্দ-উৎসবে
বঙ্গের বঙ্গ-জননী
জানায়েছে আশ্বিনেরে শরতের শুভ আলিঙ্গন,
আশ্বিনের আনন্দ বাসরে
বঙ্গের তরুণ কবি
জানায়েছে বিশ্ববাসীরে সুমধুর প্রীতিপূর্ণ শারদীয় অভিনন্দন

সোনালী গোধূলির অপেক্ষায়

তাপস কুণ্ডু

মাঠের প্রান্তে বসে শান্তির পতাকা নিয়ে আমি শুধু খেলা দেখি
রুশ-মার্কিনীদের—
হার-জিতের প্রশ্ন এখানে আসে না
শুধুই সংশয়
খেলাটা কবে শেষ হবে
মানুষ 'মানুষ' হবে কবে ?

মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে ঐ মালগাড়ী চলে যায়
প্লাটফরম্ ছাড়িয়ে
মিছে আশা বুকে চেপে জেগে থাকে ওরা।

ঠিক দুপুরের অবসানে
হাসানের তৃষ্ণা কি মিটবে না এবারেও
সোনালী গোধূলির চুম্বনে ?

আর কখনো না ঝ'রে

দিলীপ কুমার দাস

পৃথিবীটা সমতল হোক
এটা চাই না !
যদিও, পাহাড় আছে, তাই আছে সমুদ্র,
দারিদ্র আছে, তাই আছে সাচ্ছল্য,
নগ্নতা আছে, তাই আছে পোষাকের আভিজাত্য,
আছে কুলহীন, তাই কৌলিন্য ।
তবু, শ্বাপদেরা হিংসা ভুলে সমাজে এলে
মানুষের এত যুগের সমাজ চেতনা
যদি লজ্জা পায় !
তাই, পৃথিবীটা সমতল হোক,
এটা চাই না !
শুধু, এটা চাই
ফুল যেন প্রস্ফুটিত হয়,
আর কখনো না ঝ'রে ।

মহাকালের ভেরী

অপূর্ব কৃষ্ণ দাস

শোন শোন সবে ধ্বনিত হয় মহাকালের ভেরী
পৃথিবী নাশিতে আসিছে ঐ ঘূর্ণি তুফান বারি
বাজে ডঙ্কা অশনি শঙ্কা চারিদিকে কলরব,
প্রমাদ ঘটিবে শোনিতের স্রোতে তাই উঠে মহারব।
ঝঞ্ঝা মাতিবে, ডাকিনী নাচিবে এই স্বর্গ ধরা
শ্মশান ছাইবে নরের মুণ্ড কঙ্কালেতে ভরা
মারামারি, খুনোখুনি আর লাশের ছড়াছড়ি,
সমাজে জ্বলছে বিষের আগুন ধ্বংসের মহামারি।
বিবেক লুপ্ত, ভালবাসা ছিন্ন স্বার্থের পিছনে
প্রেমের নামে চলেছে লীলা, স্কুল-কলেজ-ময়দানে।
পিতামাতার নাই সম্মান, শিক্ষকের অপমান,
বয়োজ্যেষ্ঠ পায় না কদর, তারা হয় ম্রিয়মান।
ভায়ের সনে না হয় মিলন, বন্ধুর সাথে শত্রুতা,
নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়, সর্বত্র অরাজকতা।
বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে চলে শুধু প্রহসন
ন্যায় নীতি নীরব সাক্ষী, হয়েছে বিসর্জন।
মহাকালের মাদল বাজে, নাই কোন পরিত্রাণ
সামনে প্রলয় আসিছে মরণ হও সবে সাবধান।

ফুটপাত

মাণিক চন্দ্র দাস

ফুটপাত ধরে চলে মিছিল
চলে নিত্য পথ যাত্রী।
তারই মাঝে টাকার খেলা
বাঁচার স্বপ্ন দেখে হকার,
দিনের শেষে খুঁটি পোঁতে
ভিখারী যাযাবরের দল।
নিশুতি রাতে করে আনাগোনা
কিছু মুখোশ পরা মাংসাশী পুরুষ।
জন্মায় কত বৈধ অবৈধ সন্তান
এই ফুটপাতে নিশুতি রাতে।
ঠাণ্ডা রাজনীতি থেকে নয় সুপ্ত—
অভিশপ্ত ফুটপাত আজ
নেতাদের বর্ণ পরিচয় বা অ-আ-ক-খ
এই কি সেই ফুটপাত ?

বাসনা

রীতা দত্ত

ছিন্ন ভিন্ন বাসনা মোর রইল দূরে পড়ি
তুমি আসবে কবে এ জীবনে সেই কামনা করি।
জীবন যে মোর ব্যথায় ভরা শূণ্য হাহাকারে,
কবে তুমি আসবে আমার শূণ্য মনের দ্বারে।
বলবো আমি সকল কথা মনের ব্যথা ভুলে,
আসবে তুমি কবে বলো আমায় প্রাণে তুলে।
জানালায় দেখি শুধু রৌদ্র মেঘের খেলা,
ভাবতে ভাবতে কেটে যায় সারাটি দিন বেলা।
দিনের শেষে নীলাকাশে সোনালী রং ঝরে,
ক্ষণে ক্ষণে বারে বারে তোমায় মনে পড়ে।

বঞ্চিতের ক্ষোভ

মোঃ আসরাফুল হক

সমাজ জীবনে যখন রাত ঘন হয়ে আসে,
আপন পর হয়ে যায়, কেহ থাকতে চায় না পাশে।
তখন জানি—মনে হয় এ পৃথিবী আমাদের নয়,
আমরা যেন পরদেশি—পরোপকারে যতই লাগি—
তবু সম্মান মেলে না দেশি।
অতীতে অথৈ সমুদ্র পাড়ী দিয়ে, যারা এসেছিল
ফিরে গেছে—কিছুই যায় নি নিয়ে।
ঝিলের দুধারে পেতেছি দুঃখের ডেরা,
তবু সর্বনাশা ঝড়—ঝড় বহে এনে করেছে গৃহহারা।
আমরা তো নয় উড়ে এসে জুড়ে বসা চিলের মত,
তবু এ বুকে কামানের গোলা কেন করে দেয় ক্ষত ?
আমাদের রক্তে পিপাশা মেটায় যারা—
মানুষের মত বাঁচার অধিকার পেয়েছে কেবল তারা।
এক বুক অশান্তি আর হতাশায় কাটে বেলা—
কত আসি—কত যাই—শেষ নাই এর খেলা।
অথচ তোমার হাসতে দেখি পর্দার আড়ালে মুখ,
সামনে কালো উড়নী ঢাকা গোলাকার এক বুক।

মনকে ফেরাই

রূপশ্রী দত্ত

চেতনার সরোবরে গাঢ় নীল আকাশের গাঙে
সাদা মেঘে ঘেরা থাকে মনে হয় ডাকি কোন্ নামে।
চকিতে সম্বিত ফেরে সমস্তই বৃথা মরীচিকা;
প্রকৃতি বন্দনা মিথ্যে, অন্তরে যে আগ্নেয়-অঙ্গার।

সাহারার মরুভূমি, বৃষ্টি নেই খাঁ খাঁ চতুর্দিক;
আগুনের খাপ্‌রা মনে, চোখে মাঝে মাঝে নামে ঢল
সূচ্যগ্র মেদিনী নেই, স্বস্তি নেই—অতৃপ্ত অস্থির;
অর্থহীন মনে হয় কারো কোন প্রিয় অঙ্গীকার।
মুক্তির দশক কিন্তু মুক্তি নেই অন্তরে বাইরে;
মুক্তিই কি চির মুক্তিদাতা?

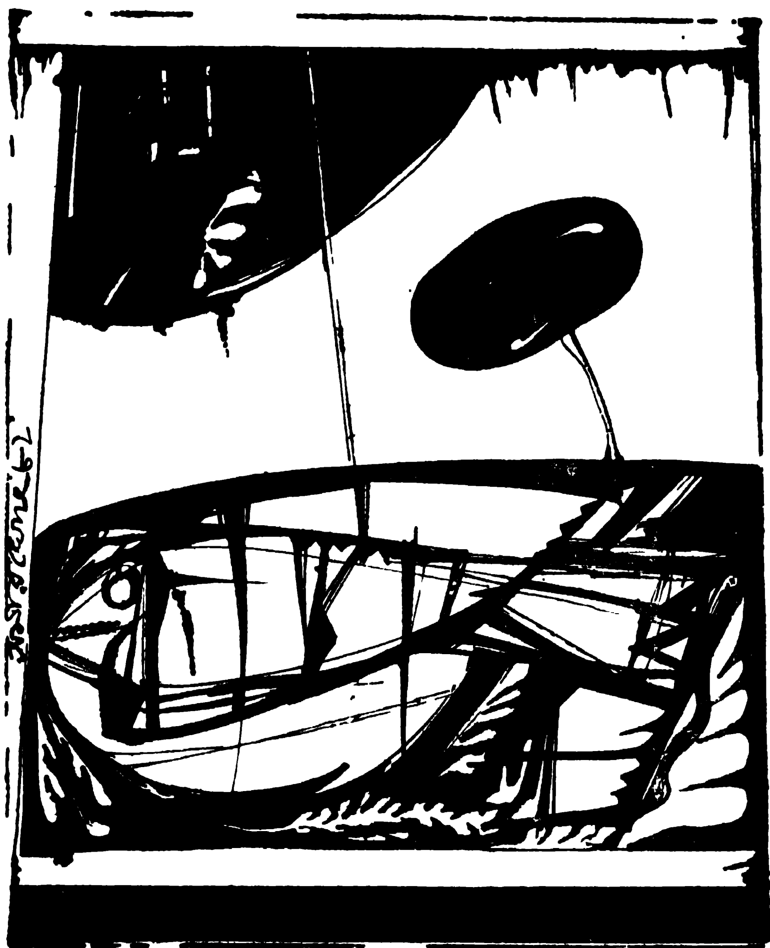
গোপন-মনের সাধ নীল গাঙে অবগাহন করা;
অপরিহার্য যত রূঢ় বাস্তবের প্রয়োজন
পরিত্যক্ত বস্ত্র সম কোন কৃষ্ণ রসিকতা ছলে
পাছে চুরি করে নেয় সেই ভয়ে মনকে ফেরাই।

আমার শুভক্ষণ

মণীশ ভট্টাচার্য

দিগন্তের শেষ সীমায়
ডুবে যায় যদি—এ সময়
এখন হাজার পৃথিবীর, হাজার সূর্য
তবু এ আমার সূর্যোদয়।
ক্লান্তি নামেই যদি —নামুক
যাযাবর পাখির পাখায়,
সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়,
তবু এ আমার প্রভাত বেলা।
ঝড়ে যাই যদি, যাক—
যত জুঁই-চামেলি-গোলাপ-চাঁপার পাপড়ি
না হোক দিগন্ত সবুজে রাঙা
তবু এ আমার ফাগুন মেলা।
বহু প্রতীক্ষায়,
বহু আশা-আশঙ্কার অবসানে,
আজ পেয়েছি তাকে—
এসেছে আজ আমার সুখের বেলা।





চেতনার মহাকাশ থেকে

হরিদাস ঘোষ

চেতনার মহাকাশ থেকে নামুক না নামুক বৃষ্টি,
আমরা তবুও তো ধৌত ক'রে নিতে পারি
দিনে পক্ষে অন্তত একবার
ঐ বৃষ্টির জলের ধারায় নিজেকে, নিজেদের।
গাছের গোড়ায় বৃষ্টির জল জমলে
তবেই তো গাছের ডালে ডালে ফলে ফুলে
সৌন্দর্য বিস্তার করতে পারে সৃষ্টির মাধুর্য।
তোমার আমার সবায়ের মধ্য থেকে
সৃষ্টি—নতুন সৃষ্টি জন্ম নেবে
চেতনার মহাকাশ থেকে পড়া বৃষ্টির জলে।
চেতনার মহাকাশ থেকে নামুক না নামুক বৃষ্টি।

অপারেশন

শোভনা সেন

জখম কলিজাটা পড়েছিলো
টুকরো, টুকরো হ'য়ে
দেহটার মাঝে।
রক্তধারা ঝরে আর ঝরে,
পিঞ্জরাবদ্ধ হাপোরের টানে।
যেন আর চলে না,
চলতেও চায় না।

দিয়ে যায় কড়া স্ক্রিট্ ঘরে,
অতি ব্যস্ত ছোকরা চাকরে।
হঠাৎ দেখি চেয়ে তাই,
আমি আর সেই ঘরে নাই।
রয়েছি দাঁড়ায়ে এই বারান্দায়,
স্তব্ধ বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায়।
চেয়ে, চেয়ে চারিদিকে,
চোখভরা ভুবনজোড়া রূপ,
ভরে দেয় বুক।
কলিজাটা করে ঢিব্ ঢিব্,
বেঠিক হলো বা বুঝি ঠিক!
আছি, আমি বেঁচে আছি,—
এদিনের এই বারান্দায়,
রব বুঝি চিরকাল
এ অনন্ত আকাশ তলে,
ফুরফুরে মধুর হাওয়ায়।

রাত্রি

মথুর বসু মল্লিক

রাত্রি তুমি ভয়ংকর
আবার তুমি সুন্দর,
কতজনে কতভাবে লেখে তোমার গান,
আনন্দ দাও, দুঃখ দাও
তুমি ছাড়া চলে না,
নিস্তব্ধ-ভয়ংকর তুমি সকলের প্রাণ।
রাত্রি তুমি ভীষণ
অনেকের তুমি মরণ,
অন্ধকার রাত হয় হীন ষড়যন্ত্রে ভরা,
রক্ত-পিপাসুরা হয় দুর্নিবার
করে কতভাবে শিকার,
নির্দোষ, নিষ্পাপের রক্তে রঞ্জিত হয় ধরা।
রাত্রি তুমি সুন্দর
সবার মনোহর,
মনোমুগ্ধকর নক্ষত্র খচিত আকাশ,
মনোলোভীরূপ তোমার
টেনে নেয় মন সবার,
নর-নারী খোঁজে মন-মাতানো আবাস।
তোমার নিস্তব্ধ সৌন্দর্য
হরণ করে কৌমার্য,
তাই নর-নারী গায় মিলনের গান,
দেহের কামনা বাসনা
জাগায়ে সুপ্ত রসনা,
কাঙাল হ'য়ে করে ওষ্ঠ সুধা পান।

একটা কিছু দাও

রমাকান্ত করণ

আমাকে একটা কিছু দাও—
বই
কাগজ-কলম
কিংবা তুলি ও ক্যানভ্যাস।

এই মুহূর্তে বিষণ্ণ পৃথিবীর
ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত এক পথিক আমি।
নিজের অলসতা কাটাতে
আকাশে দু'হাত ছড়িয়ে
মন্দারে ঠেস দিয়ে শুয়েছি।
বই একটা পেলে দু' ছত্র পড়তে পারি
কিংবা কাগজ কলম পেলে
কোন বান্ধবীকে দু' কলম লিখতে পারি
আর তুলি ও ক্যানভাস পেলে
চঞ্চলা কোন নদীর মুখ আঁকতে পারি
যা দূরবর্তিনী
কিংবা বাসস্টপে দাঁড়ানো কোন মেয়ের
দয়িতের প্রতীক্ষারত।

আমাকে একটা কিছু দাও
যা দিয়ে বিষণ্ণ পৃথিবীটাকে
ভুলে থাকতে পারি।

রক্তরাঙা পলাশ

অরুণ দেব

কুহু কুহু ডাকে মনে হয়
বসন্ত এলো বুঝি
দখিণ হাওয়া চলে, স্মৃতির পাতা ঝরিয়ে,
পিছু ফেলে আসা দিনগুলো
মনে পড়ে যায়।
সবই ফিরে আসে—জীবনের প্রথম ভালবাসা
স্মৃতি হয়ে বয়ে যায়
পাইন, দেবদারুর ছায়ায়
বসন্ত এলো যদি ফিরে
পুরনো দিনগুলো কেন এলো না—
সে কবিতা লেখার দিনগুলো
কেন রইলো পিছু পড়ে
তুমি না এলে—মন কেন রাঙালো
বসন্তের রক্তরাঙা পলাশ

রাজার-রাজা

ত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায়

কালা আমার গোরা হ'য়ে
নেচে নেচে চলে,
মহাভাবে কেঁদে কেঁদে
রাধা রাধা বলে।

ছেড়েছে বাঁশের বাঁশী,
ছেড়েছে ধড়া-চূড়া,
তবু কি স্বভাব গেছে ?
—সদা সে চিত্ত-চোরা।

থাকে সে রসে-বসে,
অ-রসিকে দেয় সে সাজা,
জগাই-মাধাই তরাণ তিনি,
প্রেমের হাটে রাজার রাজা।

শক্তিমান হাতিয়ার

তুষার ভট্টাচার্য

আমি গৃহে কুশাসনোপবিষ্ট, সুইচ টিপলাম।
ক্ষণপরেই ছুটছি আর ছুটছি অসংখ্যক বলয় পাশ কাটিয়ে
তপ্ত গ্যাসীয় পিণ্ড ভেদ করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।
সূর্যের ভিতর দিয়ে ছুটছি নিয়ত তর তর করে ফাটছে হাইড্রোজেন
(অর্থাৎ নিউট্রন ফিউশান)
সংগ্রহ করছে শক্তি সূর্য আর লেলিহান শিখা জ্বলছে দাউ দাউ
পুড়িয়ে মারা হোল না ওর ভেঙ্গে নিয়েছি ওর বিষ দাঁত
পরে নিয়েছি যে কোটি তাপ-সহা পোশাক।
জেনে নিয়েছি তেজস্ক্রিয়তার উৎস
বিশ্ব ধ্বংসবার মারণাস্ত্র কিংবা বিশ্ব সৃষ্টির ক্ষমতা আমার হাতে
ভাবছি কোন কাজে লাগাব এই শক্তিমান হাতিয়ার ?

কঠিন বাস্তবে'র পরে

অরিজিৎ সিংহ

ওগো বিচ্ছেদিতা প্রিয়া
এতদিন পরে, এই বৃষ্টিতে, জানি আমি—
জানালা ধারে বসে,
তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের সেই প্রিয় জীবনানন্দ শোনাচ্ছ।
কিন্তু আমি ?
এই নীচতলার ঘরটায় বসে কি ভাবছি জানো ?
এই পৃথিবীটা থেকে, ঘরবাড়ী উঁচু নীচু,
সব যদি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধুয়ে মুছে যেত,
থাকত শুধু একটা সমতলভূমি।
আমি সেখানে নীল আকাশের নীচে
ছোটাছুটি করে কাঁদতে পারতাম।
সে কান্নার প্রতিধ্বনি হত না কোথাও
সে কান্নাত আসও না আমার কানে।
আমি শুধু কাঁদতাম—
কেঁদে কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে ফেলতাম
আর তারপর—
সেই কান্নার জলে ডুব দিয়ে মরার আগে
বিধাতার উদ্দেশে বলে যেতাম—
হে বিধাতা, নতুন প্রজন্মে তুমি যে সৃষ্টি করবে,
তাতে যেন কিশোর-কিশোরী, যুবক যুবতী
ছাড়া আর কিছু যেন না থাকে।
তুমি হয়তো বলবে, 'কেন এমন কথা ?'
আমি বলব, 'কঠিন বাস্তবে পড়ে'।

অন্তরাত্মা লুকিয়ে নেই

গোপাল মল্লিক

বুক বেঁধে উড়তে চেয়েছি,
শহরের বুকে।
শুধু পদাঘাত নিঃসাড়ে সেরেছে
নিঃসংশয়ে।
ভারি মজবুত এই ব্যথা।
পাঁজর কাঁপানো উল্লাসে গুমরে
উঠেছে অত্যাশ্চর্য দুই চোখ।
সাজ খুলে ফেলে, জামা খুলে
শুধু দেখাতে চেয়েছে শহর।
এইখানে, ওখানে হাইড্রেনের
মুখগুলি খোলা।

খেয়াল

প্রদীপ দে

রাতের বেলা সূর্য দেখবার ইচ্ছা,
মনটাকে বিষিয়ে যখন তুলেছিল,
তখনই আয়নায়, চেহারাটা দেখলাম।
ইচ্ছার শরীরে তখন
অশরীরি পোষাক—
জানতে চেয়েছি তখনই
কাকে নিয়ে বাঁধন খেলা ?
ঘুণ ধরা রাতের বাসরে
গানের সুর বেঁধে বেঁধে,
চাওয়া পাওয়াকে 'সকালের' দাঁড়িপাল্লায়
মাপা আর—
নরম হৃদয়টাকে, কে যেন প্রশ্ন করে
আর উত্তর শোনে ;
সেটা কি "খেয়াল", যা কিনা,
নকল পৃথিবীর প্রজন্ম ।।

সব দিতে পারি যদি ভালবাসো

মিহির কান্তি রায়

সব দিতে পারি যদি ভালবাসো
আমার সর্বস্ব তৃষ্ণা আকাঙ্খার ভাষা
বেঁচে থাকার জন্য জড়িয়ে ধরা
জগৎ সৃষ্টির জন্য স্ফূর্তি ক্ষণকাল
অমূলক মিথ্যা নয়
পাপ পুণ্য বিচার না করে
হারিয়ে যাবো যদি ভালবাসো।

সংগ্রাম পূরক স্বাদ-আহ্লাদ
আমি চাই রক্তের পিপাসা
রক্ত মধ্যে বেজে ওঠে বীজের ফোয়ারা
ও যে তৃষ্ণা, চায় জলাশয়
সবুজের অন্বেষণ নিখুঁত নির্মাণ
পাপ পুণ্য বিচার না করে
হারিয়ে যাবো যদি ভালবাসো।

শ্রেষ্ঠ বিরহের কবিতা লেখো

বিজয়কুমার ভক্ত

একটা পাথরের সামনে তুমি কেন কাঁদো ?
যতোই তুমি তার ভেতরে হৃদয় খোঁজ
        শুধু নিষ্ফল প্রয়াসে বেদনা বাড়াও।

হয়তো কোনো এক মড়ক বা কোনো প্লাবনে
ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

যতোই না তুমি কাঁদো
তবু চুপি চুপি পা ফেলে প্রেম আসে,
সেই চোখ, সেই কান্না আর গভীর হৃদয়
পাথরের বুকে দাগ কেটে কেটে
গ্লেসিয়ার হয়ে যায়।

পাথরের বুক ফেটে বেরিয়ে
হে কবি
        শ্রেষ্ঠ বিরহের কবিতা লেখো।

জীবনে কি প্রেম ছিল পঙ্ককাল

মাখনলাল বিবাড় (মাহুত বন্ধু)

বাঁশের বেড়ার পাশে জল জমিন থেকে
এক ফলকে রয়েছে পার্কের ধারে
ছায়াবৃত উদ্যানে আনাগোনা তরুণ তরুণীর আলাপ।
এখন অখণ্ড অবসরে উপভোগ্য প্রেম
রিটায়ার বয়সে চেপে বসেছে পাথর বুকে
ছুটে বেড়াবার রঙিন প্রজাপতির স্বপ্ন ভাবনা,
পৃথিবীর রং বদলে গেছে
কামনার চোখে পড়ে যায় আকর্ষণের টান ।
সেই অপরিচিত ঘনিষ্ঠতার হাসিমুখে ফুটে উঠার কথা
ভাবা যায় না কল্পনীয় প্রেম হায় !
চিত্রার্পিতের মত দাঁড়ায়ে ছিল স্থায়িত্ব পঙ্ককাল !
বসন্ত যৌবনের ভরদুপুরে প্রেম খেলাঘরে
আলো কমে আসা বার্ধক্যে ঢাকা অন্ধকার চরাচরে
স্পর্শ-সুখ-সোহাগ অনুভূতির এক সমুদ্র
উথলে উঠা আনন্দের জোয়ার
মুখটিতো কেটে গেছে প্রতীক্ষায়,
একাকীত্ব গ্রাসে তীব্র বাসনা উদ্বেগ ;
নিরভিমান ডেকে নিয়ে বুঝবে কেন কণ্ঠ রুদ্ধ ?
ফেলে আসা জীবনের কাছে শুধু ফুলশয্যার রোমান্টিকতা
চোখের জলে ধুয়ে মুছে আহা !
প্রেম মণিবন্ধে ভালবাসার সুর ছিল যৌবনে পঙ্ককাল।

সুবাসিনীর হাসি অথবা আশ্চর্য কলকাতা

মণিকা দাস

খালপাড় থেকে হাঁটে দু'মাইল কাকভোরে,
ঝুপড়িতে বাছাটার তখনো নিঝুম রাত।
গেরস্ত সুবাসিনী মাথায় কাপড় দিয়ে হাঁটে,
পাছার ছেঁড়াটা ওঠে ছিটকিয়ে দাঁত ছরকুটে।

সুবাসিনী বাসনেতে শান দেয়। পরের বাসায়।

ক'দিন শ্রীঘর ঘুরে ঘরে এল ঘরের মানুষ—
নেশাখোর ; জুয়াতে সময় কাটে ;
বীরত্ব বউএর পিঠে কালসিটে দাগে।

জলের দাগেতে হাজা ফাটা পায়ে, হাতে,
সুবাসিনী বাসি পাটে মন দেয় পরের বাসায়।

হয় না স্তিমিত তার স্মিত হাসি তবু—
দুটি ঠোঁট ঢেউয়ে দোলনা ডিঙি।
উচ্ছ্বাসে যূথিকা ঝরে। দুচোখে সবুজ ফুলঝুরি।

মরি মরি সুবাসিনী একাই আশ্চর্য কলকাতা।

জীবনের ভেতর জীবন

অমরনাথ ভদ্র

কোন কোন মুহূর্তে নিজেকে যখন হালকা মনে হয়
নিজস্ব সত্বা যখন নিজের অবচেতন মনে তোলে আলোড়ন
জীবন যখন জীবনকে পাবার আশায় ব্যাকুল হয়
কত সহজে একটা জীবন অন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়
স্বপ্নের গভীরে খেলা করে জীবন
বয়স তখন নির্দিষ্ট দিকে মোড় নেয়
সময় দ্রুত হারায় জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে
জীবনের ভেতর জীবনেরই ছবি ফোটে
গভীর প্রেমের উষ্ণতা একটা বয়সকে ধরতে চায়
মাঝরাতে গভীর ঘুমে জীবনের লম্বা ছায়া পড়ে
শরীর তখন শরীরকে পাবার আশায় ব্যাকুল হয়
শ্বেত-গোলাপ আর পেলব শরীর সময়কে অনেকক্ষণ
        ঘুম পাড়িয়ে রাখে
জলের অনেক গভীরে জীবন তাজমহল দেখে।

দৃশ্যপট

কুঞ্জবিহারী দাশ

আমরা দেখি
সমকালীন সময়ের বৃত্তে
দৃষ্টির সীমাবদ্ধতায়
নানা ভাবনার প্রতিচ্ছবিঃ
সক্রেটিস্—বুদ্ধ—মার্ক্স—
জীবনের কক্ষপথে বিভিন্ন অবস্থানে।
আবার হয়তো দেখা দেয় দূরবীনে
দৃষ্টির বিবর্ধন ঔজ্জ্বল্যে
কোন কোন নতুন জ্যোতিষ্ক
নতুন প্রজন্মের চৈতন্যের আকাশে
জিজ্ঞাসার নতুন ভাষ্যে
কালের মীমাংসায়।

তাই আমাদের দেখার প্রেক্ষাপটে
সতত চলন্ত দৃশ্যের বিন্যাস।

তবুও প্রেম

শিশির গুহ

বুকের ভিতর সুখের নদী
সেখানে তোমার ছবি
সারাবেলা ক্লান্তি হীন
প্রথম কদম ফুল।

কখন যে ভেসে গেল
যৌবনের পাল তোলা নদী
দ্রিমি দ্রিমি শব্দের ভেতরে
ভেসে যাই দিনমান আচ্ছন্ন বকুল

দু'চোখে এখনও নেশা
চোখে চোখ-হাতে হাত
এখনো বুঝি না প্রেম
তবু প্রাণ তোমাতে আকুল ॥

সময় গ্রন্থি

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

মনে পড়ে একদিন ভীষণ চিনতাম
এখন কেবল চিনি আকাশের মতো
তবু ওই আকাশের কোন সিঁড়ি নেই

ভূগর্ভের শ্লেট ঘোরে, কত মৃত লৌকিক বছর
স্বরাষ্ট্রনীতি বা ধান্দা, শূন্যের অসুখে
ভুগে ভুগে মরে ঝরে, ফের

বেঁধেছি সময় গ্রন্থি মানুষের ঘর
দোপাটি চারার পাশে
তীব্র অবক্ষয়ে ঝরে পাথরের থাম

তবুও আমিতো শুধু বোঝাতে চেয়েছি প্রথমেই
একদিন শুধু তাকে ভীষণ চিনতাম
চিতল পেটির মতো চিল ওড়ে মাটির আকাশে
কোনোদিন সময়ের বুকে
জমে না আখের।

আমি সেই

বিনোদ বেরা

টানা অট্টহাসির শব্দ বাতাসে ; সমুদ্র রুসে ফুঁসে বিবাদ করছে ঝাউ ঠাসা
বেলাভূমির সঙ্গে ।

ছাই রঙের জ্যান্ত মেঘের নীচে
গাছ গাছগুলির ফাঁকে কয়েকটা মাটির ও বেড়ার দেওয়ালের
খড়ে ছাওয়া নীচু কুঁড়ে ।

জবু থবু মলিন মৎসজীবি কজন
অলস চোখে আকাশ ও সমুদ্রের ভাবসাব দেখছে ।

ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা একটি কিশোর ছুটছে ।
এক আশ্চর্য—আমিই সেই ! পিছনে কুকুর ।

একটি পোড়ো ঘরের সামনে গিয়ে সত্রাসে দেখি মস্ত ময়াল ধীরে সুস্থে
আমার দিকে এগিয়ে আসছে ! ময়াল কোত্থেকে এলো !
এই সাপ ক্ষিপ্র না, এই সাপের গতি মন্দ···
ভাবতে ভাবতে পিছন ফিরে দৌড় ।

ও হো, পিছনে যে জোড়া বাইসন ঝড়ের বেগে তাড়া করে আসছে ।
গিরগিটির ক্ষিপ্রতায় সামনের গাছটায়···

মগ ডালে বসে নীচে তাকাই—
দেখি কাছেই একটি ঝোপের সামনে যুগল বাইসন থমকে দাড়িয়ে,
ঝোপের মাঝখানে ভয়শূন্য দুটি বালক
অবাক চোখে ওদের দেখছে ।

বাইসনরা কি শিশু দুটিকে মেরে ফেলবে,
নাকি ছুটে এসে ভয়ানক ধাক্কা লাগাবে
আমার আশ্রয় গাছের পৃথুল কাণ্ডে

কাঁচা ফলের মতো প্রচণ্ড ঝাঁক্ নিতে ছিটকে পড়বো মাটিতে ?
আচ্ছা, এই বাইসনদের পোষ মানালে
মোষ হয়ে যাবেনা ?•' লাঙ্গল চষবে,
গৃহস্থের শস্য বোঝাই গাড়িও উঠাবে টানতে হয়তো বা ॥

যে কথা হয়নি বলা

ডাঃ অমূল্য ভূষণ চক্রবর্ত্তী

ঘুর্ণিঝড়ের মত চিন্তাগুলো সব
প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।
ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ডটা
বার বার মাথা ঠুকছে
পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে আসতে।

····আজ তার বিয়ে!
সানাইয়ের সুর ভেসে আসে
শ্রাবণের রাতে।
হৃৎপিণ্ডটা কাটা পাঠার মত
ছট ফট করছে।
ডাস্টবিনের পাশে
বুভুক্ষু কুকুর আর ভিখিরির লড়াই।
সানাইয়ের সুর মিলন পিপাসু
হৃৎপিণ্ডটার আর্তনাদ।
একটা বিরাট ঘুর্ণিঝড়
প্রতিহত হয়ে আসে।
স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডটা শেষবারের মত
দাপাদাপি করে চুপ হয়ে যায়।

লড়াইয়ে ক্লান্ত ভিখিরির দল
আর একটানা বেজে যাওয়া
সানাইটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাতজাগা নব-দম্পতির চোখে
নতুন স্বপ্নের আলো।
ভাঙা রেকর্ডের মত শুধু
বেজে চলেছে
যে কথা হয়নি বলা
আজ তা বলি কেমন ?

ভালবাসা ছড়িয়ে দাও

পঙ্কজ গুহ

মনের আঙিনাকে করিও না খাল-বিলে
সাগর বানিয়ে চলো খুশীর হিন্দোলে।
গণ্ডির ভালবাসায় হয় যারা স্বার্থপর
অন্যের ব্যর্থতায় ভাবে ওরা পর।
রাখিও না ভালবাসা গণ্ডির মাঝে
ভালবাসা উজাড় করো সকলের কাছে।

ভালবাসা ছড়িয়ে দাও গণ্ডির বাহিরে
কে আপন, কে পর সব চিন্তা ছেড়ে।
ভালবাসার সাগর হয়ে থাকো প্রতিদিনে
মিশে যাও যখন-তখন যেখানে-সেখানে।
মৃত্যু! মৃত্যু আছে সর্বত্র,—খাল্-বিল্-পুকুরে,
আবার কত প্রাণের কান্না মিশে গেছে সাগরে।
তবুও সাগর এক দিলদার কোনঠাসা নয় সে,
উজানে বহিতে জানে ঢেউয়ের পাখনাতে।

যদি ও জীবন

অতুল রায়

সব সুগন্ধ নির্যাস শুষে নিলে
ফুলের রেণুকোষে আর কী বা থাকে ;
যদিও বৃন্তে সাজান থাকে পাপড়ি স্তবকে স্তবকে !

শব্দময় সব কথা ভাষায় প্রকাশ পেলে
অন্তরের আর কী বা বলার থাকে ;
যদিও কণ্ঠ অস্ফুট বায়বীয় স্বর ধরে রাখে !

চোখের মণিকোঠায় সব দৃশ্য আত্মসাৎ হলে
সুন্দর আকর্ষণীয় আর কী বা দেখার থাকে ;
যদিও নিসর্গ নদী চাঁদ সব অবিকল ধরে রাখে !

জীবন চিত্রনাট্যে যা চাওয়া ছিল তা পাওয়া হলে
আর কিবা দেওয়া নেওয়ার সাধ থাকে ;
যদিও জীবনভর কবি শিল্পী প্রেরণার ছবি আঁকে।

ধুলোর আলোয় বসে

দীপালি দে সরকার

নদী বয়ে যায়, ফসল—স্রোত নেই তার
উঠানের ভিটেয় আ-গাছাড়া জন্মায়
অন্ধকারের ঘ্রাণ ভেসে আসে, আসে ভেসে
সাপের বিষ—নিশ্বাস।

বাদুড়ের ডানায় জ্যোৎস্নার লুকোচুরি
শূন্য-ধানের গোলায় চামচিকের পা
কুয়াশা নিঙ্‌ড়ে অঘ্রাণে ধানের ক্ষেত
নীরবে ঘুমায়।

হেমন্তের গান গায় কোন্ চাষী-বৌ দূরে
স্বপ্নের ক্ষয় ঝরে তার সুরে
নীল-রাত ভেঙে হেঁটে আসে দিন
টবে সাজায়ে বীজ-ধান।

ধুলোর আলোয় বসে কঠিন প্রান্তর
শোনে গঙ্গানদীর মাঝির গান।

কোথায় পাবে জননী তা

শ্যামল ঘোষ

উদ্‌রে রেখেছিল মা,
উদর ভরে খেতে দিতে পারেনি—
কাঙাল বাপটা।

একটু স্বস্তির নিঃশ্বাসে
পৃথিবীর আলো দেখেছিল সে—
মারা গেল আজ রাতে।

সারা রাত কোলে করে
বসেছিল জননী তার।
একটা একটা করে, সাবধানে
লাল পিঁপড়ে মেরেছে মা—
সন্তানের মৃত মুখ থেকে।
কীসের ভয়ে ?

যদি হঠাৎ জেগে উঠে,
দাবী করে শুষ্ক স্তনের কাছে
তার স্বাভাবিক প্রাপ্য আহারটা।
তখন কোথায় পাবে জননী তা ?

স্থানাভাব

বঙ্কিম পাল

কয়েকটা রঙ চোখগুলোকে
ঝাপসা করে দিয়েছে।

কয়েক ফোঁটা রঙিন জল
হৃৎপিণ্ডগুলোকে ঝাঁঝরা
করে দিয়েছে।

কয়েকটা ছবি পর্দাটার—
গায়ে ঘুন ধরা কাঠের মতন
উই—এর ঢিপি আজ॥

কিছু বিষাক্ত ধোঁয়া
লাঙস গুলোর উপর
ছাতা ধরিয়ে দিয়েছে॥

কতকগুলো হিংস্র পশু,
জঙ্গলটাকে ভয়ঙ্কর ক'রে তুলেছে—
সভ্য জীবগুলো যেখানে জায়গা পাচ্ছে না॥

মধুসূদন চাবরী

রাত্রি যাকে ছিঁড়ে খেতে চায়
আমি তার পদপ্রান্তে
হৃদয় বিলিয়ে দিই।

নিষ্ঠুর আগুনে তার সোনালী রঙের চুল
পুড়ে পুড়ে ছাই হয়
রক্তের ঢেউ তুলে আমি তার ছাই-চুলে সোনালী বর্ণ দিই।

যান্ত্রিক ঘোড়ায় চড়া বহুরূপী ভদ্রবাবুটি
তার সোনালী রঙের চুলে আগুন ধরিয়ে দিলে
উলঙ্গ তাকেই আমি পাথরে বাঁধিয়ে দিই।

পথের শেষে

মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ক্লান্ত পথিক এক
এসে থেমেছি পথের
প্রান্ত সীমায়।

সেখানে স্তব্ধ হয়েছে
কত পথিকের পদশব্দ।
হয়ত মিলিয়ে যাবে
আমারও পদচিহ্ন।

খুঁজবেনা কেউ আমাকেও।
হয়ত ভাববে নীল আকাশে
ছোট্ট পাখির মত
হারিয়েছি আমি,
যেখানে নীল দিগন্ত
এসে মিলেছে
সবুজ পৃথিবীর বুকের ওপর।

খুনির আত্ম সমর্পণ

রবীন্দ্র গোপ

আমি খুন করেছি রাতের পাঁজরের দরজা খুলে
বৃক্ষদের দাম্পত্য জীবন, কোকিলের সংসার সুখ
মৌমাছিদের গুঞ্জন থেকে স্বাধীনতা গান,
কলা পাতার সবুজ ঘুম খুন করে পতাকার রংয়ে
সাজিয়েছি প্রিয়ার নিপুন শাড়ি।
লাল টিপ তুলে দিয়েছি পতাকার কপালে
আমি খুন করেছি পাখিদের বাণিজ্য জাহাজে।

জাম্বোজেট উড়িয়ে এক খুনি বাতাসে হাহাকার তুলে
মিশে যায় অন্য খুনিদের দলে-কেউ দেখেনা তাঁকে।
আমার যৌবন খুন করেছে বালক বেলার লাজুক মুখশ্রী
সকালের রোদ রাতের কোমল আঁধার খুন করে
নেশাখোর দজ্জাল বেশ্যা হিহি করে হেসে ওঠে
রাতের জমানো পাপের সম্পদে নরকের সিঁড়ি বেধে দেয়
আমি খুন করেছি মেঘের পুত্রকে, চাঁদের বুড়িকে।

আপনারা বলুনতো কেউকি আমাকে খুন করতে দেখেছেন?
আমার পেছনে বন্দুকধারী দালালের চামচা ঘুরছে বলে
আপনারা ভাবছেন কি আমি খুনি, একজন কবি কি খুনি হয়
হত্যা করতে পারে আপনার সার্বভৌম অধিকার?
হ্যা পারে, অন্তত কেউতো পারেই।
এই যেমন আমি রবীন্দ্র গোপ ভালোবাসার আগ্নেয়াস্ত্রে
একজন স্বাধীন সার্বভৌম নারীকে খুন করেছি।

স্বপ্ন ও বাস্তব

মাখনলাল প্রধান

মগজের চাবি খুলতেই দেখি, মনের হাতে চিঠি
সচক্ষে দেখার মতো জানতো না হয়তো।
হাতের কাছে বিশ্বের বিপুল হাতিয়ার
তারপর চলে ঠুকঠাক্
স্বপ্নের ম্যাপ মিলিয়ে, মিলিয়ে;
বাস্তবের মুখোমুখী শুরু হয় তীব্র রেশারেষি
সাস্পেন্স অহর্নিশ কমলে-কামিনী করে বেড়ায়।

তারপর একদিন দরজাটা টান মেরে খুলি,
সম্মুখে ফেটে পড়ে নগ্ন বাস্তব।
যা করতে চায় মন, ছাঁচের সবটুকু মিল হয়নি তার;
তাই পেয়ে আপনি বদলায়
কাগজে কাগজে যখন নগদ আদায় চলে।
বিপুল এই খুটিনাটি চিবোতে থাকে,
চিবোতে থাকে জেলির মতো মগজের পাবলিশার্সের ব্যর্থতাকে

পদ্মার স্মৃতি কলরব

খোকন দাস

তোমাকে দেখিনি কত বিস্তীর্ণ দুপুর
কোন হ্রদে সরোবরে তোমার নূপুর
বাজে না কেন পদ্মার স্মৃতি কলবর
তোমার কোমল অন্তরে বেদনা সব
কি মনে করো.. ফেলে আসা চন্দ্র মধুর
শুধুই ছিন্ন, রিক্ত পরিত্যক্ত বধুর ?

তাহলে আজ জাহ্নবী তুলে নাও, বীণার
ঝংকারে সিক্ত শাব্দিক শুষ্ক মিনার
ছিড়ে দাও অন্তরাল, বদ্ধ খাঁচা যত
জমাট বেঁধেছে যারা স্ফটিকের মত
সর্বত্র প্রনয় নামে বিকৃত কালিমা
এনে দেয় বাদল, তামসিক নীলিমা—
আরো কিছু এনে দাও ঘন সুবাতাস
ঐ মানুষ, স্বদেশ শান্তি নাও আকাশ

নতজানু দৌবারিক

রমানাথ চট্টোপাধ্যায়

আহা কী ধবধবে স্রোতে ভেসে যায় উলঙ্গ বালিকা,
তুলে নাও, রত্নাকর, লজ্জিত হয়ো না, দ্যাখো সম্মুখে
কী বিশাল প্রতাপ।

গৈরিক কাঁচুলি ওকে এনে দাও। নোতুন সৌন্দর্যটুকু ওর
যেন সব ধুয়ে যায় না কো। ওই দিব্য অগ্নিশিখা
কেন দ্রুত নিভে যাবে? প্রকৃতির তরল বিবাদ
আজ শান্ত হোক আর আদিগন্ত শিল্পিত বিভোর।

নাহলে বাল্মীকি, তুমি ব্যর্থ তোমার কল্পিত
আদি প্রেম বা আদিম বেদনার্ত হৃদয়ের ক্ষুব্ধ উচ্চারণ।
প্রবল বিকীর্ণ জ্যোতি মুছে দিক প্রতিষ্ঠায় স্থিত
প্রাচীন কলুষ। স্রোতে ভাসমান ওই শুভ্র উদ্দীপ্ত বরণ
রূপসীর জন্য হোক চতুর্দিকে শ্যাম পটভূমি
সমতল। রত্নাকর, সেখানে আনতজানু দৌবারিক তুমি।

কাঠুরিয়া

প্রকাশ কর্মকার

ওহে মানুষ
ওদিকে যেওনা
ওদিকে কাঠুরিয়ারা হিংস্রতায় গাছেদের শুইয়ে রেখেছে
বিশাল মহীরুহ লাশ শুয়ে থাকে একের পর এক
ওখানে জঙ্গল সাফ্ হয়ে আকাশের ফ্যাল্ ফ্যালে চাঁদ
এখন আর লুকোচুরি খেলছেনা

এখন কাঠুরিয়ার উনুনে ভাতের ফ্যান্
হাত দুটো সরু সরু পেট ফোলা ভীষণ লজ্জায়
কিন্তু কাস্তের ঝিলিকে আগুন—
সূর্যের সকালে এলাকায়। দূরে রেঞ্জারের জীপ
টাকা ফুঁকতে চলে যায় লোকালয়ে

ও কাঠুরিয়া
ওখানে গাছের নীচে বনবিবি থাকে
আস্ত ছাগল গিলে, রেঞ্জার বোতল খুলবে
তোরা সিন্নি খাবি

দূরে বহু দূরে মাদলের আওয়াজ এখন
বৃক্ষের দোলনায় যুবক যুবতীরা
খেলা করে চাঁদের আলোয়

এখন এই জঙ্গলটা কাটা হয়নি

শীতার্ত উটোপিয়া

প্রসেনজিৎ মাইতি

সাম্প্রতিক শহুরে নীড়ে
সার্বিক প্রাণ ও পাপ নিজস্ব আছে।
অথচ বাহুল্যের ভীড়ে
মুমূর্ষু ম্লান কোন মীড়ে
গোধুলীবেলার সাজে এ এক অস্থিরতা বাজে ;
জাগ্রত স্বপ্ন
কল্পনায় কেউ আংশিক উটোপিয়া, অর্থাৎ
অভিভূত আমার হিয়া
সমগ্র প্রেমে ও ঘৃণায়
কেন ? কেন ? কেন ?
মৌনতার দেয়াল-ভাঙা অন্ধকার গাছে
শোকে ও শাপে
রাঙা ঋতু ফলন্ত আছে—
দেবী, বেদনায় মনে থাকে যেন !

এখনো আসা যায়

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনো আসা যায়।   আশা করা যায়।
এখনো ধূসর পাণ্ডুর পথে পা বাড়াই নি।
রক্ত-হিম-করা কালকেউটের বিষদাঁত
এখনো ভাঙেনি আমার দেহে,
নীল জমাট বাঁধে নি শিরায় শিরায়।
জীবনের ছেঁড়া ছেঁড়া সময়ে
কানাগলিতে এখনও রোদের ঝিলিক মারে।

তাই এখনও আসা যায়—
আশা করা যায়

আদিম প্রশ্ন

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

কি আমি ?
দিলে পরিচয়। তোমাদের পরিচয়ে—
আনলে মোরে, আমি নতুন আগন্তুক।
তোমাদের সুরে শেখালে গান,
ভাষা দিলে প্রাণে।

তবুও বলো আমি আলাদা, সেপারেশন মোর সবখানে ?
পাই যত আঘাত ব্যর্থতার দহনে,
তোমাদের কিছু নয় ?

মাতলামি ভরা মাতালের হাট,
শত শত কুকুরীর আর্তনাদ,
চিতাবাঘের লকলকে জিভ
তোমাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে হারালুম ভারসাম্য,
নিয়ে গেল মোরে পাগলা গারদ,
সেই হোল সত্য ? আমি পাগল ?

শরীরের কাছে

দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সে একটা অল্পবয়সী নদী
নদী বলে :   প্লাবনেই আমার উচ্ছ্বাস
প্লাবন বলে ঃ   দুঃখের গন্ধ মাড়িয়ে
          আমি উৎসবের আয়োজন করি ;

এ ভাবেই সে একটা অল্পবয়সী নদী
নদীর ভিতরে প্লাবন
প্লাবনের ভিতরে উৎসব হ'য়ে
ছুটে আসে শরীরের কাছে।

আজ এই জ্যোৎস্নায়

পরিমল রায়

আজ এই জ্যোৎস্নার সমুদ্রে স্নান করছি
একেবারে সম্পূর্ণ শরীর ডুবিয়ে
        পূর্ণ অবগাহনে !
স্বপ্নের গহ্বরে বিলীনাস্ত আমি !

খণ্ডমেঘও নেই আর আকাশের বিমুক্ত জাজিমে
        স্নিগ্ধ হাতের ক্ষীণ নক্সা হয়ে :
নারীর ঠোঁটের মত জ্যোৎস্না এসে
        চুমা দিয়ে যায়
        আমার উন্মুক্ত শরীরের উঠোনে।
মনে হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখী আমি।
সাম্রাজ্যের সিংহাসন সহজেই ভুলে যাই আজ।

বঞ্চিত হল যারা আজ এই
        লাস্যময়ী জ্যোৎস্নার অভিরূপ থেকে
        স্নান আজ হলনা যাদের
অপূর্ণ সাধ নিয়ে ফিরতে হবে তাদের
        বারবার পৃথিবীর বুকে,

সকল ইচ্ছা-সাধ-শখ-চাওয়া নিয়ে
অপেক্ষা করতে হবে
অমাশেষে শুক্লা চতুর্দশী
যুগ থেকে যুগ—কাল থেকে কাল
শুধু এই পুণ্য লগনের জন্য,
পূর্ণ অবগাহনের জন্য
রোমাঞ্চিত জ্যোৎস্না-সমুদ্রে।

আয়রে খুকু আয়

হীরেন্দ্রকুমার মিত্র রায়

আয়রে খুকু আয়
তোরে দেখলে পরাণখানি অমনি ছুটে যায়।
স্বর্গ হ'তে নেমে আসি'
তোরে বিধি ভালবাসি'
গড়লেন তিনি বুঝি তোর এমন মোহন কায়,
আয়রে খুকু আয়।

তোর ঐ নাচনখানি
পরাণ মোর নেয়রে টানি
স্বর্গ বুঝি নেমে এল এই ধরনীর গায়,
আয়রে খুকু আয়।

মোর চিত্ত তনু মন
তোর লাগি অনুক্ষণ
পলক না ফেলে তারা তোর দিকেতে চায়
মিষ্টি হাসি মোর প্রাণেতে পবন বেগে ধায়
আয়রে খুকু আয়।

সভ্যতার রূপ

সরোজ কুমার পাণ্ডে

পৃথিবী হতে কে যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল
আমার গচ্ছিত প্রেম ভাণ্ডার,
ভূ-পতিত হল বিশ্বের নিরন্নের দল,
কারাগারে কাঁদে অসহায় মানবের দল।

মশাল হাতে অট্টহাসিতে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল
আমাদের সুন্দর প্রকৃতি,
হাহাকার রবে জেগে উঠল প্রাণীদল
সভ্যতার এ সুন্দর উপহার !

সভ্যতার, কলঙ্কে জ্বলে গেল গরীবের আবাস,
আকাশে ভেসে উঠল কালো মেঘের রাশি,
মেঘে মেঘে ঘনঘটা বিচিত্র সভা,
ভাঙে আর গড়ে স্বার্থের ক্ষমতা ;
শূন্য হয় গরীব মায়ের ঘর,
সিঁদুর মুছে ফেলে নিরন্নের দল।।

দীনের ঘরে এল না চেতনা
ক্ষনেক বাদে ব্যথা ভুলে মিলে যায়-
জনতার ভিড়ে,
পিতৃ শোক পতি শোকে নাই কোন ঘনঘটা
সবই মিলে হয় দু'ফোটা অশ্রু ধারা।

এদের গৃহে জ্বলে না প্রদীপ
তমসার মাঝে নিত্য নতুন পথ খুঁজে
অজস্র বাঁধা পেয়ে পুনরায় ফেরে
জরাজীর্ণ জগতের মাঝে।
তাই পৃথিবী হতে হারিয়ে গেছে
আমার গচ্ছিত প্রেম ভাণ্ডার ॥

কবিতায় এমব্রয়ডারি

মধুসূদন ভট্টাচার্য

ব্লাউজের হাতায় সামান্য অদল বদল—
ব্যস, ম্যাজিক !
আধুনিক কবিতায় সামান্য অদল বদল—
ব্যস, ফ্যান্টাস্টিক !

ব্লাউজের হাতায় শাড়ীর বিপরীত রঙের
এমব্রয়ডারি—বৈচিত্র্যময় !
আধুনিক কবিতায়—
পুরোনো ঢঙের এমব্রয়ডারি—
যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি হবে বুদ্ধির পরিচয় ।

প্রান্তিক

অজিতেন্দ্র সিংহ

এ প্রান্তে আমার সাথী
সবুজের স্মৃতি ;
ফসলের ছিল দিন
নীল ফুলে ভরা,
সে ফুলের গন্ধ নিয়ে
বয়ে যেত নদী,
ঝিরি ঝিরি হাওয়া দিত
হিজলের ডালে,
খেত দোল
লেজ-ঝোলা পাখীটি
মধুর সকালে।

এ প্রান্তর শূন্য এখন,
রিক্ত আমি একা
উড়ে যেতে দেখি সব
সাঁঝের বলাকা।

দূরে দূরে গাঁয়ে গাঁয়ে
সন্ধ্যাবাতি মিটি মিটি জ্বলে,
ভোগারতি হয় জানি
নিত্য দেব দেউলে দেউলে।

গোধূলির রঙে ফোটে
রাত্রির রূপ,
প্রান্তিক দিনগুলি
কাটে চুপ চুপ
কী যেন পাওয়ার আশায়,
সফল হতে চায় রাত্রি তপস্যায়।

চিঠি

মানসী সিন্‌হা রায়

প্রিয় মারিণা,

কোন এক অজানা অব্যক্ত বেদনা
বারে বারে সাড়া দিয়ে যায়
মন আঙিনায়।

জানি না, চিত্ত-বনে কে বসে ওড়ায় মহাশূন্যে ঘুড়ি ?
কার করের শাণিত আকাঙ্ক্ষার
অনিবার্য ছুরি
রাঙাবে হৃদয় মোর
এই বেদনা, হয়তো
তারই পূর্বাভাস !

'হে প্রসিদ্ধ আশা', কি উজ্জ্বল আলো তব !
মন-আঙিনার আঁকা ছবি
পায় সর্বোত্তম অমরতা,
বাসনাই শুধু মোর অভিষেক।

এই ঘর

অশোক কুমার চক্রবর্তী

এই ঘর যেন অন্ধকার অরণ্য
মোটা কার্পেটে এবং দামী সোফায়
আলস্য ঘুরপাক খাচ্ছে
ঘুমের ওষুধের প্রভাবে।

বাহিরে দাঁড়িয়ে ছবির মত সকাল—
দরজাটা ভেজানো তাই ভিতরে আসতে পারেনি,
এই ঘর, যেন অন্ধকারের ময়লায় চোবানো
দগ্ধ পাখীর ডানার মত নিঃসাড়।
অথচ, অলক্ষ্যে আসে এক একটি সকাল
তারই চিহ্ন নিয়ে হেঁটে চলে যায় দিন নিঃশব্দে,
ধীর পায়ে, ঘরবাড়ি মাড়িয়ে
তবু এই ঘর, খুঁটে খুঁটে তুলে নেয়না সেই রোদ্দুর
অথবা সুন্দরের গুঁড়ো
এই ঘর অন্ধকারের কাঠামোয় ছাওয়া
নিঃশব্দ রাতের মত—
এর আকাশ, বাতাস, জ্যোৎস্না সব যেন কালো।

সর্বস্ব মুখ

রূপক চক্রবর্তী

তাই মালঞ্চ ভরে ছিলো পুষ্পভারে,
ছিলো কোথাও দুঃখী ছিন্নমূল।
হৃদিতে এসে গূঢ় ছায়াপাত
সম্ভ্রান্ত সেই মুখ।
কালো অলক বিপর্যস্ত উদোম হাওয়ায়,
কপাল জুড়ে আগুন রঙা চাঁদ,
চোখ আজকে কৃষ্ণভ্রমর,
ও মুখ দেখেই জীবনপাত।
প্রেম যে কখন লুকিয়ে ছিলো জারুলডালে,
পাতার ফাঁকে বদ্ধ ভালোবাসা।
ও সখী তুই ফিরে আয় কাছে।
ও যে আমার গৌরীরই মুখ।

হৃদিতে এসে গূঢ় ছায়াপাত
সম্ভ্রান্ত সেই মুখ।

কবিতার জন্য কবিতা

—মৃণালকান্তি দাশপুক্কা

আমি কবি : সোনালী কবিতার কবি !
আমার ভালোবাসা কবিতাকে আমি নিজেই
করছি বলাৎকার অহরহ ।
কথা শেষ হয়ে গেছে আমার,
দর চেনা চোখ চেনেছে কাব্যলক্ষ্মীকে !
ভাব ; অভাবে খাচ্ছে চাবুক !
সুনীল আকাশটাকে ঘেঁটে তাই
বারে বারে ভাসাই সৌদাগরী ভেলা ।
অতীষ্ঠ অমৃতহীনতা ডেকে আনে এলোকথা,
জীবন বাঁধা থাকে ভাতের গন্ধ
আর এ্যাস্ট্রের গণ্ডিতে,
—সূর্যের আনাগোনায় ।
কথা যতটুকু বলি,
এতই গহীন—গহরীই শ্রেয় বোধ হয় ।

বেওকুফ

শম্ভুচরণ বর্মণ

আজও কিছু বোকা আছে পৃথিবীতে
হয়তো ওদের মৃত্যুই নেই বলে।
নইলে, সেই সে বন্য জীবন থেকে আজ অব্দি
এই স্টার ওয়ারের যুগেও ;
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওরা এমন ভিসুভিয়াস হয় কেমন করে,
কেমন করে পৃথিবীর অরণ্য প্রান্তরে মাঝে মাঝে এমন দাবানল হয়,
বজ্রবিদ্যুৎ নিয়ে দুরন্ত মেঘ হয় কেন বার বার।
কেন ওরা মানতে চায় না চার্বাক দর্শন,
ডাইনোসেরাসের নিশ্চুপ উপস্থিতি,
বিশাল ভয়ংকর অজগরের শীতকালীন ঘুম।
বেওকুফরা কি পেয়ে গেছে পৃথিবীর গুপ্তধনের খবর,
পেয়ে গেছে তার নিশ্চিত ফর্মুলা ?
মৃত্যুই নয় পৃথিবীর শেষ সত্যকথা,
অন্যায়ের স্বীকৃতি দাসত্বেরই জাসি বদল।

অঙ্কুরিত হবার সুযোগ

নিত্য গোপাল তরফদার

ঐ যে সকলের অগোচরে পড়ে আছে
অবহেলিত একটা বীজ।
অঙ্কুরিত হবার সুযোগে—
শাখা মেলবে প্রকৃতির বুকে।
বিকৃত মস্তিষ্ক যুবকটি মাথা খুঁড়ছে।
লাগবে যে!
ওর যে 'পেট্রোল' নেই।
বোকা কোথাকার।

শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে বলছে:
পৃথিবী তাকে প্রতারণা করেছে,
নইলে সে ও……।
বোকা কোথাকার!

বৈমাত্রের প্রেম

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সে আমার কাছে আসে বুকে টেনে ভালবাসে।
জানিনা সে কেন আসে, বুকে টানে কিবা আশে ॥
এইভাবে কাছে এসে সবাই কি যায় ফেঁসে ?
ভালবাসে ভালবাসি কার টানে কাছে আসি।
জীবনে জীবন দিয়ে আমি যারে ভালবাসি ।।
লোকে বলে রিপু টানে মোরা নাকি কাছে আসি।
ভুক্ত ভোগী স্বজনে এ প্রেম শুধু জানে।
এ প্রাণে ব্যথা পেলে কত লাগে তার প্রাণে।
হৃদয় আছে যার সে যেমন ভালবাসে ।।
বাস্তবতা আছে যার এই প্রেম সেই বোঝে।
রিপুটারে দূরে রেখে আমি তারে ভালবাসি ।।
স্নেহধন্যার বিচারে হেথা পুরুষত্বের হয়েছে ফাঁসি।
মুখে যারে বোন বলি তারে কি কুকথা বলি।
এ যুগের সর্বত্রই কি মনুষ্যত্বের হয়েছে বলি ?

সেই দিন আসিবে না ফিরে

লীনা পাঠক

রণসাজ আজ তব নাহি সাজে
রাজা আজ নিরন্ন কাঙ্গাল।
আজ ওঁরাই চালাবে শাসন
জানাবে সিদ্ধান্ত জয়-পরাজয়।
আর, কারো নাহি কোন প্রয়োজন
বৃথা ভেবে—
বৃথা শক্তি করে অপচয়॥

তবু যদি ব্যথা বাজে প্রাণে
জ্বলে যদি অনির্বাণ—
সুতীব্র দহন, হে তপোধন!

এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়—
সেই দিন আসিবে না ফিরে
যবে বীর ধর্ম ছিল চির জয়ী
আজ অজেয় জনগন।

রাজতিলক ও সে

সৌমিত্র ভট্টাচার্য

কপালে রাজতলিক কেটে
আলোকোজ্জ্বল বদ্ধভূমিতে তাঁর প্রবেশ
দূরের অলংকৃতকারীর চোখের সরল রেখায়
দেখা দেয় স্থায়ী মোঁচর,
নিপাট খুটে আঙুল চলে যায়
কড়িবড়গার হিসাব কষতে,
তেলোহাড়িটা তুলে ওঠে ঘাড়ের উপর।
আহাঃ······ ·   ।
কোন গরমিল নেই
ঠিক যেন দূরের কাঁটাতারের ফাঁকে।
সোনালী আঁচলের প্রলেপ
—বোধীর ঝলকানি।
অসহায় পাণ্ডিত্যে—
তবুও মুণ্ডু দোলে
ডান থেকে বাঁয়ে
কপালে রাজতিলক কেটে!

পূজা

রতন কুমার রায়

আমার ছোট পিসিমা সন্ত বিধবা।
তিনি এখন সদা
শুচি বাই-এর বেড়াজালে ঘেরা পূজো আহ্নিকে ব্যস্ত ;
দিনান্তে একবার আতপ চালের আহার—তাও নিরামিষভোজী

শুচিতার বেড়া পেরিয়ে
প্রাণের ঠাকুর আসে কিনা জানি না,
তবে জোর করে তিনি যৌবনের দুর্বার গতিকে
বাঁধা দিয়ে মনকে পিছনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান।

আমি তাই মাঝে মাঝেই
পিসিমার আতপ চালের ভাতে মিশিয়ে দিই ঘি।
আর নিরামিষে মুগ মুসুরের বড়ি ;
আর—ঠাকুর দেবতার ছবি সরিয়ে
সেখানে রেখে দিই
একটি বিকলাঙ্গ জীর্ণ শীর্ণ শিশুর ছবি।

ভাবছি ঘুঁণে ধরা সমাজটাকে বদলানোর পূজা শেখাবো।

শান্তিময় শীলদাস

দেশমাতৃকা সবার উপরে খাঁটি যে দেশের মাটি ।
উজ্জ্বলি উঠি উজ্জ্বল কর, কর মাটি পরিপাটি ॥
মানুষের মত বাঁচায়ে মানুষে ধন্য কর মানুষ নাম ।
অমানুষে কর মানুষ তোমরা বাড়াও তাদের দাম ॥
উদার চেতনা উদার হৃদয়ে উচ্চ আশা রাখিও মনে ।
শক্তি সাধনা সার্থক তরে এক সাথে চল কর্মী সনে ।
ভালবাসা ঢেলে পথ কোরে নিও, যাবে দূরে বাধা সুনিশ্চয় ।
গৌরবে মন ক্রমে বড় হবে গাইবে সকলে প্রাণের জয় ॥
জীবন ধর্ম লক্ষ্য করি সচেতন হোয়ে চলরে সব ।
হৃদয়-সাগর গভীরেতে ডুবে মহৎ বাণীর শোনরে রব ।
ন্যায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত হোয়ে প্রাণের শক্তি জাগানো চাই ।
নতুন জগত গড়িবে তোমরা জাগো কর পণ সকল ভাই ॥
ভেদাভেদ যত ভুলে যাও সবে, ভেদনীতি সব ভুলিয়া যাও ।
তোমার আমার সবার ভাল, প্রাণের ভাল বিলায়ে দাও ॥

ঈশ্বর প্রণিধান

সুধীর কুমার দত্ত

আমি স্থূল এ বিশ্বের সৃষ্টির বিস্ময়।
সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বহীন, অচিন্ত্য অব্যয়
ঈশ্বরকে জেনে বল কি আমার লাভ ?
ত্যজিতে পারি না কভূ আপন স্বভাব।
ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আমি চাহি বাঁচিবারে।
নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর কি দিবে আমারে ?
তাই সূক্ষ্ম চৈতন্যের ধারি নাক ধার
স্থূল বুদ্ধি নিয়ে করি স্থূল ব্যবহার ;
অচিন্ত্যের চিন্তায় বৃথা কালক্ষয়
করিবারে অবসর আমার কোথায় ?
ওই আকাশ বড় সত্য আমার জীবনে
ওই চাঁদ মিশে আছে মোর প্রাণে মনে।
ঈশ্বরকেও গড়ি আমি ধূলা-মাটি দিয়ে
ভূমায় কল্পনা ছাড়ি অণু-বস্তু নিয়ে।

বেকার

আব্দুস্ সালাম

বাংলা মায়ের তরুণ ছেলে নামটি কাঙ্গালী
মৃত্যুকে যে করে না ভয়, তাইত বাঙালী।
নামের সঙ্গে অভাব যাহার আছে জড়িত
এটা কি সৌভাগ্যের পরিহাস ভেবে ক্লান্ত।
জন্মের পর মাতৃ ক্রোড়ে ছিল অবোধ শিশু
বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে হলো বেকার পশু।
চাকুরী যাহার জুটল না একটা—ভাগ্যে—
দুঃখ করে বলে তরুণ নামের গুণে পাশের বোঝ আছে সঙ্গে।
বেকার হয়ে জীবনটা যাবে শেষ হয়ে
দুঃখের কথা বলব কাকে? বেকার ভাইয়ের কাছে
লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাতে প্রাণ করে ছটফট
সংসার আর সমাজ ছেড়ে পালাই তেপান্তর।
বনের পশু বনে থাকে ঘুমায় নিরালাতে
মনের দুঃখে ছুটে পালাই বেকার ভাইয়ের কাছে।

যদি তোমায় পাই

দীপঙ্কর বিশ্বাস

যেখানে,
গ্যাস লিকে শ্মশান হয়ে যায় এক শহর,
কবি মোলাইস হাসতে হাসতে ফাঁসি কাঠে ওঠেন,
বন্দুক হাতে সীমান্ত পাহারা দেন নিকারাগুয়ার বাসিন্দারা,
সৃষ্টি হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যায় বোমারু বিমান ওড়ায়,
ক্যানসার রুগীরা অসহায়ের মতন মরেন ;
নবজাতককে খেয়ে নেয় রাস্তার কুকুরে
রুগীর পাশে শুয়ে থাকে কুকুর বেড়াল,
ডিসেম্বরের শীতে জন্ম নেয় বিংশ শতাব্দীর বেকাররা,
সেখানেই তো আজি অন্ধকারটা গুঁড়িয়ে
আলোর জায়গা করে দিতে চাই।
পারবই যদি তোমায় পাই,
অথচ তুমি ? উদাসীন !

এবারের মত শেষ করে পালা

স্বপন সিংহ

যাও তুমি, জুলেখা।
আমি যাবো অন্যত্র
এবারের মত শেষ করে পালা।
সন্দিগ্ধ চোখে শুষে নেব
পৃথিবীর সুখ-রস
আগাছার মত॥

সময় মন্দ, তাই
বুক চেরে তরমুজের মত ভাঙা সকাল
ভোর হবার আগে
নিভে গেলে চিতার আগুন
সহাস্যে হেঁটে যাবো
রমনীর বুকে পা রেখে।

লিখে নিও

কৃষ্ণকিশোর সরদার

আর পৃথিবীতে সকাল আসলেও আসবে না উচ্ছ্বাস।
কত অগনিত মানুষ সরে গেছে এই পৃথিবী থেকে
একটুও ক্ষতি নেই।

কিন্তু যে ফুল ফুটতে চেয়েও ফুটতে পারেনি?
ঝরেও পড়েনি?
খুব ভোরে কিছু বর্ণের খোঁজে হেঁটেছিল এরা
রাস্তায় ঝুঁকে পড়া সরু কঞ্চির বোঝা ঠেলে।
কিন্তু বিবর্ণ হয়েছে কাঁচ আকাশ, তখনো ঢেউ ছিল,
ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল সকাল, এল দুপুর আর
কলাবাস্নার খড়খড়ে শব্দ।

যোগ হল পৃথিবীর নিয়মের ভাঁড়ারে
জন্ম-মৃত্যুর মত আরো একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

বাস্তব

বেণু দেবী

নিদাঘ দাহে খারাপ জ্বালা। বৃষ্টি বিহীন দেশ
অভাব নিয়ে ঝালা পালা—কোথায় সুখের লেশ ?
নেই রাজ্যের নৈরাজ্যে জীবন নাজেহাল
ছেলে বেকার, অগত্যা চরা‍‍য় গরুর পাল
মাত্র ক'টা জিনিষ কেনা তাও দোকানে নিত্য দেনা
ছাড়ে নাড়ী—ছিঁড়লে শাড়ী—আর যে হবে না !
যুগের যত নতুন ফ্যাশন—স্বপ্ন সে সব বিলাস ব্যসন
শূন্য ভাড়ার কনট্রোল এ মেলেই নাক র‍্যাশন
উল্টো স্রোতে ভেসেই চলি নেহাৎ নিরুপায়
পাতার পোষাক চালু করে তারই প্রতীক্ষায়।
মিষ্টি ? সে তো শব্দ-বাহার ! বস্তু বরবাদ
আকাশ ছুঁতে সাধ্য বা কার থাকুক যতই সাধ ?
আমের দামে থাম-ই কিনে জানাই এ খবর
ইদানিং : ছাই লোড্-শেডিংও ধরায় মাথা জবর !

মানসী

গৌতম চৌধুরী

মানসী ওগো মানসী আমার
প্রেরণা আমার শক্তি আমার,
তোমার তুলনা তুমিও ওগো —
জগৎ মেনেছে হার।
মানসী ওগো মানসী আমার
চেতনা আমার গর্ব আমার,
আমার এ বোধ সে-ওতো তোমার
ছন্দ তোমার মঞ্জীরের
সুন্দর যা-কিছু বিশ্বের মাঝে
ঋণী হয়ে আছে তোমার কাছে,
তোমার মহিমা অসীম, অপার
মানসী আমার সুন্দর আমার।

ভাত

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপোর হাঁড়িতে ভাত ফুটছিল,
বাসমতী চালের গন্ধছড়ান ভাত,
দুয়ারে ভিখিরী এক
এক বুক শ্বাস টেনে বলে
'একটা দানাও কাটেনি দাঁত,
মা লক্ষী, দাওনা দুটি ভাত !'

ছোট বেলকুঁড়ির মতো
শুভ্র সুঠাম সুগন্ধি ভাত,
ফেনের স্রোতেতে নর্দমায় যায় ভেসে,
এই দেখে সে আহ্লাদে ছুটে আসে,
কিন্তু তখনই বাবুর কুকুর
সবেগে করে ধাওয়া,

এক বুক ক্ষুধা নিয়ে ভিখিরী পালায়
কেউ বোঝেনা দুদিন হয়নি খাওয়া
ওদিকে বাটির খুদগুলো ফুটে একশেষ
একটাও হয়নাতো বেলকুঁড়ি ভাত
নাকের শিরাগুলো মিছে টানটান।

এদেরই কুঁড়ি ফুটবে বাসমতী—
নর্দমায় গড়াবে সতেজ দানা,

খরা না বন্যায় নয়
মানুষের বুকেই দুর্ভিক্ষ দেয় হানা,
তাই মুঠিবদ্ধ থাকে হাত,
মুঠো খোলে দেয়নাকো দুটো ভাত।

এ কালের আফ্রিকা

গৌতম সাধুখাঁ

অন্ধকার গহ্বর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল—
এ কালের আফ্রিকা।

গাঢ় সবুজ কিশলয় আর বনস্পতির দল
ভাষাহীন ক্রন্দনে হল খাঁ-খাঁ, আফ্রিকা।

হাহাকার আর আর্তনাদে পরিপূর্ণ হল
চিরপুরাতন-চিরপরিচিত, এ কালের আফ্রিকা।

যে আফ্রিকা ছিল চিরদিন
বনানীর নিবিড় পাহারার অন্তরালে—
আজ তার রক্তিম প্রাচীরে ঢুকলো অগ্নিপিণ্ড,
ধূম্র গহ্বরে জড়ালে, অচেনার বেড়ি,
বন্দী হল এ কালের আফ্রিকা।

আফ্রিকাবাসীদের পেটে জ্বলে উঠল ক্ষুধাগ্নি,
শেষ হল আফ্রিকার চির গৌরব—
শব দেহে ভরে গেল এ কালের আফ্রিকা।।

প্রেম করি

উজ্জ্বল কুমার

মনে হয় প্রেম করি
আবার নূতন করে—
পুরনো সব স্মৃতি
ছুঁড়ে ফেলে দি
কোন এক ডাস্টবিনে !

নূতন সূর্যের মতো
পূর্ব আকাশে
মনটাকে রাঙিয়ে তুলি ।
পূর্ণিমার চাঁদের আলো ছড়িয়ে-
অন্ধকারকে মুছে ফেলি
আমার জীবন থেকে ।
নূতন জীবন নিয়ে প্রেম করি
কোন নূতন প্রেমিকাকে

অন্ধ অনুভূতি

অশোক বিশ্বাস

তুমি বসেছিলে সেদিন সমুদ্র-সৈকতে
প্রাক্-সন্ধ্যার আলতো আঁধারের ওড়না জড়িয়ে
একা-একা বসন্ত আগমনের ক্ষণ গুনে,
উঠেছিল নিশানাথ পূর্ব-অম্বরে
রশ্মির শ্বেত-ঝালোর উড়িয়ে ;

তোমার যৌবনের আনাচে-কানাচে জেগেছিল
অচেনা শরমের শিহরণ
তুমি ভেবেছিলে—এই বুঝি আসে বসন্ত
মনের আঙিনায় স্বর্গ-সুবাস ছড়াতে—কিন্তু,
সেদিন সে আসেনি—তুমি বসেছিলে নীরবে
পয়োদের আনা-গোনায় চোখ রেখে,
দূর ঐ গীর্জায় বিভাবরীর শেষ ঘণ্টা বাজা অব্দি ।

মাঝ ব্যোমে পঞ্চমীর বিধু বিলীন হতে চেয়েছিল—
তুমি দিয়েছিলে বাধা—শূন্যের বুকে সাথীহারা
বেদনাতে ডানা ঝাপটানো পাখীর মত
তৃষিত কণ্ঠ স্বরে বলেছিলে—
'ওগো চন্দ্রমা তুমি মলিন হ'য়ো না
বধু-যে এখনও আসেনি কাছে ভরেনি কোন বাসনা' ।।

আয়না

কল্লোল দত্ত

আমি সব আয়না ভেঙে ফেলেছি
কেন জানেন ?

সেদিন ভিড় বাসের হঠাৎ ঝাঁকুনিতে
আয়নার দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেলাম
দেখি একটা বাঘ অসহায় হরিণের পানে ঝাঁপ দিচ্ছে

দুপুরে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দরাদরির সময়
হঠাৎ পাশে পানের দোকানের আয়নায় দেখি
আঙ্কল টমকে হেলী চাবুক মারছে

সারাদিনের রাগ, হতাশা আর অপূর্ণতা নিয়ে
রাতে শুতে যাবার সময় আয়নায় দেখি
একটা ক্ষুধার্ত মাকড়শা সারাদিনের একমাত্র নিশ্চিত সাফল্য
জালে আটকে থাকা অসহায় পোকাটার দিকে এগিয়ে চলেছে

সকালে ঝলমলে আনন্দ নিয়ে আয়নার দিকে তাকাতেই দেখি
সুদৃশ্য রাজপথের নীচে আণ্ডারগ্রাউণ্ড নর্দমার নোংরা গন্ধ
তাই আমি সব আয়না ভেঙে ফেলেছি
আচ্ছা, আপনারা কি কখনও আয়নায় নিজেদের দেখেছেন ?

ধর্ষণ

গৌতম কুমার দে

কাল রাতে কারা রেখে গ্যাছে
কথাময় বালিয়াড়িতে
নোনা রক্তের ছাপ
নোংরা অন্ধকারে শ্যাওলা সবুজ
অঙ্গনে এক নির্মম কলমচি
ধর্ষণ করেছে ;
ধ্বংস হয়ে গেছে অপমানে
সে ভালোবাসা—
শংখশুভ্র কাগজে কালো আখরে
লেখা—আমার প্রিয় কবিতা ।

বীভৎস

কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ

দুঃখেরই গান গেয়েছি কত সুখের গানতো হয়নি গাওয়া
সুখের আশে চলতে গিয়ে হয়েছে বিফল সকল পাওয়া।
পথের মাঝে হয়েছে দেখা সুখের সাথে হঠাৎ আমার
দেখেছিলাম একটিবার নিরাবরণ মুখটি তাহার।
পলকহারা শিকারী-চোখ সর্বনাশা হাসির আড়াল
পৌরুষেরে পাড়ালো মুখ আপিঙ্গল কুন্তল জাল।
মিথ্যা সাথে বেসাতি তার তুলনাহীন ফন্দী-ফিকির
আটক রাখি চির সত্যে তুলছে সদা মুক্তি জিগির
মায়ায় ঘেরা পাপের কারা মিলবে দেখা ভাঙলে বেড়া
দুঃখের মাঝে সত্য শিবে দোবীর সাজে সবার সেরা।
ধন্য সেই সুখেরই নীড় চরমপাপে পরম নিবিড়
ছলচাতুরী প্রতারনায় আরাধনার সাধন শিবির।

শুভকামনা

আশিস সোম

মাত্র দশটা পয়সা দিয়ে বিদেয় করতেই
বলে উঠেছিল এক ভিখিরি :
বেঁচে থাক বাবা সুখী হও।

ঘাম রক্ত ঝরাতে ঝরাতে শেষ হয়ে যাচ্ছি
তবুও
এত বড় শুভকামনা
কেউ কখনো করেনি
আমার জন্তে।

পাখি ডাকে নিচুস্বরে

প্রভাত লাহা

বুকের ভিতরে ছিল কাঁকড় বিছানো পথ
পথের দুপাশে মফস্বলী-দুঃখ,
সেই দুঃখের ঠোঁটে টুকরো সুখের খড়কুটো।
সেই খড়কুটো মুখে ভালবাসার এক হলুদ পাখি
বুকের ভিতরে বসে আছে,
খুব নিচুস্বরে ডাকে,
মন্ত্রের মতো খুব নিচুস্বরে কথা বলে।

বুকের ভিতরে ছিল হারিয়ে যাওয়া এক পথ,
পথের দু'পাশে ছিল ভাঙা বৃষ্টির মত কান্না,
কান্নার ভিতরে ছিল মন-কেমন-করা এক চাপা দীর্ঘশ্বাস

বুকের ভিতরে কেবলই পাখি ডাকে
খুব নিচুস্বরে ডাকে……

পথ নেই

সুজন সারথিকর

জোড়া ফুসফুসে বাঁশের আওয়াজ
বাতাস কোন দিকে ?
শরীর যেখানে শরীর নেই
আতৃষ্ণা বুক চৌহদ্দি হামা দেয়
পাঁজর কোন দিকে ?
যেখানে হৃদে স্পন্দ নেই।
ভাস্কর্য্য আঁকা চোখ
ভালবাসা নেই !
তুষারে বেপথু ঝোড়ো হাওয়া
পালাবার পথ নেই।
রোদ্দুরে ম্রাণ শিরা টান্ টান্
লাল লোহিতে চিম্‌নী ধোঁয়ার ধুম্ !
লাল শালুরে কফিন ঢাকা
কোন খানে দিই চুম্ ?

গাংশালিকের দল

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

গাংশালিকের দল মাঝে মাঝে সোরগোল
তোলে আনমনে, যখন উদাস মানুষের
আচ্ছন্ন চিন্তা। কুলুধ্বনি মন্দাকিনী ভেসে যায়
বুকে নিয়ে স্নেহসিক্ত আকাশের আলোক মঞ্জরী
সীমাহীন সাগরের কলকণ্ঠে পরাতে মিলনমালা।
ছায়াচ্ছন্ন বন, নীরব কুলায়, নিভৃতে আলাপরতা
কুঞ্জ কুটির জীবনের লীলা নিকেতন
স্তব্ধতার প্রতিমূর্তি প্রায় বিস্মিত প্রত্যয়।

নিভৃত পদসঞ্চার গোপন প্রেমের মত
বোধির দীপ্তির মত, কোমল স্বপ্নের মত
বারে বারে আসে আর যায়—।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হ'য়ে আসে করুণ কল্পনা
তৃষাদিগ্ধ মরীচিকা ছড়ায় কুহেলী—
ভুবনমন্দিরে কালের মন্দিরা দুহাতে বাজায় কে?

নিহত আত্মার প্রতি

বিপ্লবরঞ্জন ঘোষ

তোমার বুকের তিনটি পাঁজর ভেঙে দেবার
পর মুহূর্তে কি ভেবেছিলে তুমি ?
অথবা, তোমার হৃদয়ের এক ঝলক্
তাজা রক্ত, কার নিষ্ঠুরতাকে প্রত্যক্ষ করতে
বেরিয়ে এসেছিল ?

তুমি তো সেই কবি।
অতৃপ্তি-বেদনা-অশ্রুকে নিয়ে
অহংকারী হয়েছিলে।
এবার পৃথিবীর সব ঘৃণা—মৃত্যু অভিশাপের
উত্তরাধিকার নিয়ে
তুমি কবি
নির্জন কফিনে আরেকবার কবিতার পশরা সাজাও।

মেহেরের কোমল হাত তোমার বুকের পাঁজর
ভেঙে দেবার পর মুহূর্তে
তুমি যা ভেবেছিলে, অথবা,

হৃদয়ের এক ঝলক্ তাজা রক্ত দেখে
তোমার যা মনে হয়েছিল তখন
তুমি তা প্রকাশ কোরনা।

শুধু আর একটিবার
পরাজিত শের আফ্‌গান
তুমি অহংকারী হও।

জানি না

কালীপদ দাস

প্রেমধারা বহে বসন্ত মলয়ে
তোমার ফাগুন উৎসবে।
আমার আকাশে খরা রোদ্দুর,
ফাগুন এখানে এখনো আসেনি কেন
তা' জানি না, জানি না।
তোমার বাগানে কুসুমিত ফুল
সুরভিত করে দিন-রাত।
আমার বাগানে শুকনো কুসুমের
বেদনা-অশ্রু আমাকে কাঁদায় কেন
তা' জানি না,
জানি না।

অথচ

বিনোদবিহারী বর্মণ

আকাশে নেই চাঁদ
পাশে নেই তুমি
অথচ আমার ঘুমঘুম চোখ,

বাতাসে বয় না মন্দ
গন্ধ নেই ফুলে
অথচ আমার হাসি-হাসি মুখ

চিন্তায় ধরা মাথা
বুকেতে আগুন জ্বালা
অথচ আমার খুসিখুসি মন;

চৌদিকে আঁধার শুধু
নীরব সকল শব্দ
অথচ আমার গুন্‌গুন্ গান।

অসহায় এক কিশোরী

সাইফুল মোল্লা

একদিকে গুমার হাট, অন্যদিকে মথুরাপুর
মাঝখানে বিদ্যাধরী খাল।
খালের উপর পারাপারের জন্য কাঠের সাঁকো।
উনিশ বছরের এক কিশোরী
এই সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে
আত্মহত্যার কথা ভাবছে।
ছেলেটি কথা দিয়েছিল, সামনের মাসে সিঁদুর পরাবে।
সামনের মাস পেরিয়ে গেছে—
তিন মাস তের দিন আগে।
ছেলেটি কথা রাখেনি!
আর মাত্র কয়েক মাস পরেই—
কিশোরীটি মা হবে।
যন্ত্রণার পৃথিবীতে আসবে এক অবাঞ্ছিত
নিষ্পাপ ফুলের মত শিশু।
কিন্তু কি হবে তার পরিচয়?
কিশোরীটির মুখের সাথে এখন আকাশের,
অদ্ভুত মিল।
আকাশ থেকে ঝরা বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়
চোখ থেকে গলা বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় না।
অথচ, চোখের বৃষ্টি আর আকাশের বৃষ্টি
এক হয়ে ঝরে পড়ে অথৈ জলে।
ভেসে যায় দূর দিগন্তে কোন এক
অজানা মহাসমুদ্রের বুকে।

কিছু চাইতে যেওনা

মায়া দত্ত গুপ্ত

যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাওয়া তোমার মুখখানা দেখলাম।
মিনতি রায়, ওর কাছে তুমি কিছু চেওনা।
ও তোমাকে কি দেবে বলতে পারো?

তুমি জানোনা, আমি ওকে জানি, খুব ভাল করে জানি।
ও দায়িত্ব যত্নবান নয়।
তুমি ভেবেছিলে, তোমার দুঃখী বুকটা ওখানে গিয়ে জুড়োবে
বোকা মেয়ে আমার!
ও শুধু নিজের কথা ছাড়া কারো কথা ভাবেনা, জানো কি?

ওই ছবি,
ওই ধূপকাঠি,
ওই জল-বাতাসার থালা—
ওগুলো সবই দায়িত্ব এড়াবার জন্য।
ও নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না।
লক্ষীটি, কথা শোন, মিনতি রায়, ওর কাছে কিছু চেওনা।

উত্তম রায়

অতঃপর প্রজাপতিটি মারা গেল—
অনেক দিন, অনেক মাস; অনেক বছরের
কাছের আত্মীয়টি রইল না
দীর্ঘ দিন ভাঙা ডানা নিয়েই সে
তাকিয়েছিল আমাদের দিকে।
উড়তে উড়তে পড়ে গিয়ে যখন সে
শুঁকে নিত—ঘাসের গন্ধ মাটির স্নেহশীল সুবাস!
তখন আমরা—নিরুত্তর ছিলাম,
প্রতিশ্রুতি স্তব্ধ ছিল, ক্ষয়িষ্ণুর আর্ত আবেদনে।
তারপর।
প্রীতি ছাড়া পাথরের উপর একদিন আছড়ে পড়ল
ভাঙা ডানার প্রাণীটি।
তার পর আর উডতে চায়নি তার ডানা কিংবা
তার মসৃন রং—ছড়িয়ে পড়েনি—
দোদুল্যমান ফুলের উপর।
উত্তাপে তার মৃতদেহটা পাণ্ডুর হয়ে ছোট্ট হয়ে
যাচ্ছে; পিঁপড়ে এসে খুবলে নিচ্ছে তার
ঐতিহ্যময় দেহ।
অথচ, আমরা—অন্ধ মানুষগুলি
তন্দ্রাছন্নের মতো পাশ কেটে চলে যাচ্ছি দূরে
এবং অনেক দূরে, মৃতপ্রজাপতির ধ্বংসাবশেষ ছেড়ে
অন্য কোন অদ্ভুত দেশে।

তেপান্তরের মাঠ

চন্দনকুমার বৈদ্য

পুরনো জায়গায়
ফিরে যেতে ইচ্ছা করে
কিন্তু পাথরগুলো এখন মনে পড়ে না

সেই
পথের বাঁকের অন্ধ ভিখারী, অট্টালিকা,
চুনবালি খ'সে পড়া
দেউলের সোপানে বসা জুটো চড়াই,
পাখীর কুজনে ভরা পুরনো অশত্থ গাছের ছবি
আজো আমার মনে পড়ে ।

সেই পথই আজ অজানা অচেনা ।
পথে নেমেই দেখি
সামনেই সেই চিরপরিচিত পথ !

তারপর কি ?

দেউল, নাকি অট্টালিকা, নাকি
অশত্থ গাছ, নাকি কোন মোড় ?
কিছুই মনে পড়ে না
তেপান্তরের মাঠ ।

হেমন্ত মাইতি

বিরাট হিমালয় আলোতে ঝলমল,
অসীম জলধি জীবন মহিমা,
সুনীল মহাকাশ উদাস গম্ভীর
মাটির ভাবনা কৃষ্ণ-সনাতন :
ভারত-বিভূতি ভূমার প্রক্ষেপ।
এখানে বৃষ্টি ঝরায় বেদগান
এখানে সমীরণ প্রণব মন্ত্র
এখানে সাধনা অগ্নিহোত্রী
সবুজ প্রান্তরে অমল শান্তি।

মিলিত নানা জাতি এখানে আত্মীয়
নেইকো ভাষাভাষী বর্ণে দ্বন্দ্ব।
এখানে হিংসা ঐক্যে পরাজিত
পতাকা উড্ডীন ত্যাগে—দীপ্ত।
পাখিরা গান গায় চারণ চর্চা,
বাগানে ফুল ফোটে আত্মপ্রত্যয়,
এ-বড় গর্বের এ-বড় তৃপ্তির
ভারত সংহতির ভারত মৈত্রীর।

আজকে কেন তবে ভ্রান্তি দানা বাঁধে!
নখরে মাটি ছিঁড়ে গোপন শত্রু!
বাতাসে বারুদের অশুচি হল্কা!
নদীতে রক্ত দারুণ ব্যাভিচার!

কুটিল চক্রীরা ধ্বংস মহড়ায় !
কুঁড়িরা মুদে আঁখি আকাশে কালো মেঘ ।
জনতা চোখ মেলো ভারত রত্ন-
জননী ব্যথাহত দু-চোখে জলভার,
সাগরে ছুঁড়ে ফেলে ফুলের বৃন্ত
অটুট রাখি এসো জাতির গৌরব ।

রবীন্দ্রনাথ

স্মব্রত চক্রবর্ত্তী

সঙ্গীতের গভীরতায় কাব্যের অন্তঃস্থলে
যেখানে প্রদীপ্ত
উজ্জ্বল এক দীপ
সর্বদা চেতনার
করে আলো দান।

চরম পরম হয়ে অন্তর সৌন্দর্যে
হয়ে ওঠে মধুর মহিমায় গড়া
ভাবের শ্বেত পদ্ম
হৃদয় সরোবরে—

সেইখানেই উপস্থিত তোমারই
সেই নাম
বিশ্ব পরিচয়
অমৃত অক্ষয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!

এ বছরে বলো

জয়সূর্য ভট্টাচার্য

যে কথা হয়নি বলা
এ বছরে বলো।

তারাদের ভারে ক্লান্ত আকাশ নীল
উল্কা খসা রাত্রি দেখে বলো,
যে কথা হয়নি বলা, এ বছরে
সেই কথা বলো।

ডুবুরীর নিঃশ্বাসের সুখ মাখো
মুক্তোভরা ঝিনুক, গভীর জলে;
যে কথা হয়নি বলা, এ বছরে
সেই কথা বলো।

আর ভেবো নাকো মনে—আঁধার ঘরে
প্রদীপশিখা কাঁপুক নেভার ভয়ে,—
যে কথা হয়নি বলা
এ বছরে বলো।

ফিনিক্স

প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিষ্মান এখন নিষ্প্রভ, লাবণ্য সব ঝরে গেছে।
পোলোগ্রাউণ্ড থেকে জেলরোড, তারপর
ড্রিমল্যাণ্ড আবার পোলোগ্রাউণ্ড—এই আবর্তেই
আমরা রোজ চলেছি।

অমিত লাবণ্যর স্মৃতি ঘেরা পাহাড় আমাদের টানে না
চলতে চলতে সবই ভাবি—রাজনীতি সমাজনীতি মায় অর্থনীতি।
চার্চিলের সিগার থেকে যুদ্ধনীতি—কিছুই বাদ পড়ে না
কেউ কেউ বলে—কেন এই থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড় ?
ফিনিক্স হও না। যাও পুড়ে যাও, এসো নব কলেবরে।
কিন্তু অভ্যাসের জাড্য থেকে কি করে ছিটকে যাই ?
এ শুধু নিষ্ফল আর্তি আর অর্থহীন অসামর্থ্য।
ফিনিক্স হওয়া আমাদের ভাগ্যে আর ঘটে না।

রাত্রির তপস্যা

তাপস মুখার্জী

রাত্রি কহেছিল—
সকলের ধারনায় "তুমি"
নিজেকে করো না ভুল
যেয়ো না আমায় একলা রেখে
হয়ো না তাদেরই একজন।

কতদিন যে রই একলা
লাগে ভীষণ সমস্যা,
জন্মসূত্রে পাওয়া (বা ছিল) কয়লার রংটা
কাটে অনাদরে
তাই ভালো লাগে না সহিতে আর।

এবার "তুমি" আমার শেষ প্রত্যাশা
মনে হয় দিতে পার ভরসা
যদি দাও আশ্রয়—
আমার হতে মিলিবে অন্তরের আলো
তা হতে পারে তোমার পরম গর্ব
সাথে রাত্রি জানিবে "সে" জীবন্ত।

ফাগুন এল অসময়ে

শিবানী গুহ

ঐ মরুভূমির দেশ থেকে
কি বয়ে এনেছিলে—
দখিনা বাতাস!

তাই—হবে।
না—হলে
গ্রীষ্মের এই প্রচণ্ড দাব-দাহে
শরীর ও মন যেখানে ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন
মনের সজীবতা হারিয়ে—কেবল
রিক্ততায় ডুবে যাচ্ছিলাম ক্রমশঃ
সেই শুকান মনে
ফাগুনের দেখা মিলল আজ
এই অসময়ে?

মনের বনে ফাগুন এলো
এক নিমেষে ধুয়ে গেল
সকল রুক্ষতা।

সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা

অময় কুমার সোম

পৃথিবীটা ধ্বংস হলে—
        কেউ কাউকে দোষ দেবে না।
বোমা পড়ুক—মানুষ শেষ হয়ে যাক
পাঁচশ কোটি মানুষের ছাই উড়ুক—
এ দেশ থেকে ও দেশ
        কোন জাতি, ধর্ম-মানবে না।

কি হবে আর বেঁচে
রোবট, কম্পিউটার করবার জন্ত—
                কয়েকটি প্যারি।

সাবাস মানুষ—
'তুমি মরে গেছ'—
তাই এই পরিকল্পনা!
তোমাকে কবর দেওয়া উচিত।
গড়ে উঠবে বিংশ শতাব্দীর পিরামিড—।
বনের জন্তরা দেখবে।

ব্যাঙের আধুলি

কিরণময় গঙ্গোপাধ্যায়

কর্পূর হয়েছে দুধ ফিডিং বোতলে
দেহ আজ মজা ডোবা ফ্যাল ফ্যাল আঁখি,
'ডিউ স্লিপ' হাতে নিয়ে শুধু ব'সে থাকা
কত আর কাঁদবে শিশু, রাত নেই বাকি।
ঝলসানো বার্তাকু যেন একদা প্রেয়সী
প্রেমিকের শূন্য চোখ, সব সত্তা হারা,
দাবিপত্র স্তূপাকার বাহুল্য বিহীন
সমাধানে দিন যায় রাত হয় সারা।

জন্মলগ্নে শঙ্খধ্বনি সঘনে নির্ঘোষে—
কাল যায়। দীর্ঘশ্বাস। কবচ মাদুলি
লটারি টিকিট আর পাথুরে আশ্বাস
এ জীবনে হয়ে আছে ব্যাঙের আধুলি।

জানা হয়ে গেলে

অবিনাশ রায়

জানা হয়ে গেলে শুধু মনে হয় এতই সহজ ছিল যদি
আগে তো ভাবিনি।
এরই জন্যে অন্বেষণ সমস্ত বুকের রাজধানী, আলগলি
সমস্ত গহন গ্রন্থ কীটের মতন বুকে হেঁটে
খুঁজে বেড়িয়েছি সেই প্রাণ ভোমরা শব্দটিকে : হাওয়ার ভেতরে
সবটুকু সঞ্জীবনী, সবটুকু আয়ু খরচা করে
খুঁজেছি রক্তের মধ্যে কতখানি অ্যালকোহল থাকে।

আমি এই পৃথিবীতে কতকাল অকিডের মত
বেঁচে আছি, সুপ্রাচীন মুদ্রা যেন বহু হাত-বদলানো সময়
হৃদ্‌পিণ্ড ছুঁয়ে যায়। চতুর্দিকে জনস্রোত তুলে আছে
কেমন নির্ভুল লক্ষ্যে অদৃশ্য তর্জনী।
বারংবার ফিরে আসে একই নারী, একই সহবাস
স্থানকাল পাত্রী শুধু বদলে যায়
মঞ্চ ঘোরে, দৃশ্যপট সরে।
জানা হয়ে গেলে তাই মনে হয় এতই সহজ ছিল যদি
আগে তো ভাবিনি।।

আবেদন-নিবেদন

পিনাকী রঞ্জন কর্ম্মকার

পথ ভুলে যদি বন্ধু আমার
আসো মোর ফুল বনে,
আমি বারে বারে তাই
মালা গাঁথি সে-কারণে ॥

নয়নের জলে মাধুরী মিশায়ে
দেব ফুল মালা চরণে বিছায়ে
মুছে নেবো যত পথের কালিমা
অঞ্চলে সযতনে ॥

প্রতিদানে কিছু চাহিবোনা ফিরে
জানিও পাষান হিয়া,
শুধু দিয়ে যাবো যাহা আছে মোর
অন্তর নিঙাড়িয়া।

শ্রাবণ নিশীথে যদি মনে পড়ে
তোমারে স্মরিয়া যদি আঁখি ঝরে
সে-ব্যথা আমার জানিবেনা কেহ
রবে সে আমার মনে ॥

সেদিন আষাঢ়ে ঘন তমসা
জেগে ছিলো বারে বারে
শ্রাবণ গগনে জমেছিল মেঘ
নীরবে গিয়াছে সরে ॥

আজ গহন রাতের জ্যোছনায় ভাসে
কত না রূপের রাশি।

চঞ্চল দশ-দিশি
আধেক মায়ায় আধেক ছায়ায়
কী কথা রয়েছে মিশি।
দুখের বালুর চরে দু'টি কুঁড়ি বুঝি
এক হ'য়ে ফোটে— মিলনের মন্তরে ॥

কথা দিয়ে ছিলে তুমি

মধুসূদন সিংহ

তোমার আমার কথা ছিল
অপেক্ষায় ছিলাম তাই,
গোলাপের আতরে
যুথির যৌবনে
মল্লিকার গুঞ্জনে
একটি হৃদয় যে সাজান ছিল,
তবুও কি আকাশে চাঁদ হেসে ছিল।

তুমি আসবে বলেছিলে রজনী
ভুলতো করে বলনি
শ্মশানে বা কবরের পাশে
রমনীর চোখের জলের মত
শাশ্বত ছিল তোমার বাণী
তাইতো জানতাম এতদিন
গভীর রাতের একমুঠো জ্যোৎস্নার মত
সত্য বলে।

আজ তো আর তোমাকে নির্ভেজাল বলতে পারিনা
তোমার মধ্যেও আজ শঠতা—
চাঁদের কলঙ্কের মত।
মিথ্যের দম্ভেভরা সিন্দুকটা জেগে বসে আছ আজও
খুনির মত বিশ্বাস কে খুন করে
নিজেকে কুৎসিত করে তুলেছ আরো
ভালোবাসার চোখে।

কথা দিয়েছিলে তুমি
রাখোনি ত তুমি,
যদি আর মাধবী, জুই, বকুল
কখনো না ফুটে
তুমি কি খুব বেশী বিস্মিত হবে ?
(যদিও তুমি ছিলেনা
মাধবী, জুই, বা বকুল)
তাইতো ছিলে এতদিন।

ভালোবাসা আসছে

দিলীপ কুমার সেন

তুমি প্রশ্ন করো
আমি উত্তর দেবো,
যদিও শক্ত ভাবে
তবুও তো কিছু বলা হবে
এমন নিস্তব্ধতার থেকে।

আমি ডুবে যাচ্ছি, গভীরে, আরো আরো গভীরে
একাকীত্বে
আকাঙ্খিত শয্যায় তুমি আছ, আমিও
অথচ যোজন ব্যাপী দূর থেকে ডাকাডাকি।

হয়তো তুমি আছো, কিংবা আমিই আছি
আঁধারে আলোতে তুমি প্রাণহীন,
স্পন্দহীন মাংসস্তন
তাই যোজনব্যাপী দূরে চলা
আমারও চলা।

নিজের সাথে কথা বলা শেষ হয়ে গেছে
আমি শুনছি
আঁধারের নিস্তব্ধতার বাণী
যেন কত বুকভরা হাহাকার মেশা ভাষা,
এখন চোখ খুললেও যা, বন্ধ করলেও তাই
তবু চোখ খুলে আগুন জ্বালাই না আঁধারে
দেখি, তুমি কত যোজন দূরে।

তুমি প্রশ্ন করো

আমি কঠিনভাবে উত্তর দেব

তবুও দেখবে ভা-লো-বা-সা আসছে

আসছে

আরও কাছে

এ গহন অন্ধকার ঠেলে ।

তখন আবার নতুন করে চেনা ॥

আগামীর দৃঢ় অঙ্গীকার

বিদ্যুৎ ঘোষ

শরতের হিমেল সন্ধ্যায়
রেখে যাব একরাশ স্মৃতি।
একমুঠো ঘুম স্বপ্ন……
ফুটপাতে অর্দ্ধনগ্ন কিশোরের জন্য,
প্রভাতী নিলীমায় একমুঠো কবোষ্ণ রোদ্দুর।
স্থিরতা আর অস্থিরতার দ্বন্দ্বদোলায় দোদুল্যমান,
এ পৃথিবী।

সভ্যতার শিরোপাবৃত—
শতাব্দীর অভিন্ন পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতার দল,
আদিম সংস্কৃতির জয়গানে উল্লসিত।

রেখে যাব—
শতাব্দীর যৌবনের জন্য,
আগামীর দৃঢ় অঙ্গীকার।
একগুচ্ছ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পাশে—
একরাশ সবুজের উজ্জ্বলতা।
আর আগামী সুবাসের জন্য—
বিশ্বশান্তির একঝাঁক শ্বেত পারাবত॥

প্রত্যক্ষ করে এমন

ডালিয়া সরকার
আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে,
এমন শক্তি ওর ছিল না।
তাই ফিরে গ্যাছে বারে বারে
অক্ষম
তাই গভীর চুম্বনের ঝাঁঝ নিবে গ্যাছে
ওর কাছে।

'ভালবাসা, ভালবাসা' করে চিৎকার করেও—
বোঝাতে পারেনি—ভালবাসে,
তাই থমকে ছিল।

আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনি বলে,
রোষ ছিল।
মোট কথা, আমাকে প্রত্যক্ষ করে,
এমন শক্তি ওর ছিল না।

জেনেও

শুভংময় চার

আমরা জেনেও লস্ করি :
লস্ করি কিছুটা ভালবাসা-
সুখ-আনন্দ…

যৌবনের প্রগাঢ় সন্ধিক্ষণটা কাটাই অনাহারে
বৈষ্ণব সেজে।
বর্তমান যুগের ধার্মিকের মতো
পথ ভ্রষ্ট হয়ে
পুরুষত্ব হারাবার সময় পেরোনোর আগেই
হারিয়ে ফেলি
বাউলের সুর।

অথচ আমাকে গাইতে হবেই
সংসার তো বলে তাই।

দুঃখের মিছিলে

বাসুদেব চক্রবর্তী

নর কঙ্কালের মিছিল চলেছিল রাজপথের ডোবা, খানা, খন্দ পেরিয়ে
মাইনে বাড়ানোর দাবি।

ক্ষুধার্ত মানব শিশু রিকেটস
ভক্ষন করছিল বিয়ে বাড়ির ফেলে দেওয়া পাতায়
সাথে চারপেয়েরা।

আশা বেঁচে থাকবার ওয়াগন ভেঙ্গে
বাঁচতে কি দেবে রেল পুলিশের গরম সিসে?
নোংরা গন্ধ, মশা, ময়লার পাহাড় ফুটপাত কোথায়?
আকাশের নীচে সংসারটা শুনছিল মাইকে,
গরীবি নাকি হটে যাবে দেশ থেকে।

জানে না মেয়েটা কবে কি ভাবে হারিয়ে গিয়েছিল।
ঐ বিরাট বাড়িটার নিচ দিয়ে ঘাম আর রক্তের
নদীকুলে আজ চোখের জল মিশে গেল
ভেসে হারিয়ে গেল সব কিছু।

ছিল এক দীর্ঘ মরণ ঘুম

শান্তনু প্রামানিক

আর ছিল এক মরণ ঘুম—
রক্ত জড়ানো দুই চোখ, মধ্যরাতে
শরীরে তার নেমে এলো খেলা—
জ্যোৎস্নায় হেমন্তের সেই মাঠে হিমছিল
ছিল আরো দূর কোন অবহেলার গান।

আমিও চুপি চুপি দুয়ার খুলে রেখে
চলে গেছি সেইখানে—
যেইখানে সারারাত জ্যোৎস্নার মত স্বপ্ন
স্বপ্ন অথবা জ্যোৎস্না ঘুরে ঘুরে জলের সব স্তরে—
ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখি তার মুখমণ্ডল, শরীর ও পোশাক
জলের আরো গভীর ছায়ায় মায়াবী শরীর—
হঠাৎ ঘুম জড়ালো, মরণ ঘুম—
দুই চোখ রক্ত জড়ালো—।

ব্যাখ্যা

অরুন কুমার ঘোষ

উজ্জ্বল বার্ণানের আলোয় রঙিন
বাদামী মুখ, চাঁদ ঝরা জ্যোৎস্নায়
স্বপ্নালু সোনা, গড়ে উঠে প্রেম :

কঙ্গোর অরণ্য কিম্বা সাইবেরিয়ার
ছুঁচালো গাছ অভেদ্য অক্ষয়, দিন
যেথা রাত, রাত যেথা গভীর অন্ধকার ।

মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো নেমে আসে
ভীরু রাত-বিরহ-বিচ্ছেদ ।
ল্যাম্প পোষ্টের উজ্জ্বল আলোয় সে মুখ
আজ পোড়া অ্যাসিডের কালোক্ষত ।

আনন্দ যেথা যন্ত্রনা, কবিতা যেথা
বিষাদ, অহমীকা যেথা মৃত্যু ।
হিমালয়ের শুভ্র তুষার আজ বরফ
গলা জলে সাগরের নোনা পানি ।

শিল্পীর কান্না

বিরাম সরকার

শিল্পীর কান্না কি কখনো শুনেছো বন্ধু ?
কিন্তু, আমি শুনেছি—
হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর ভগ্নস্তূপে
অজন্তা-ইলোরা-খাজুরাহোর প্রান্তরে
তাজমহলের শুভ্র পাষাণে
—সেই কান্না আমি শুনেছি।

কলমের হৃদ্‌স্পন্দন কি শুনেছো বন্ধু ?
কাগজের আর্তনাদ ?
শূন্য চেয়ার টেবিলের হাহাকার ?
—কবির পবিত্র আসন।

কিন্তু, আমি শুনেছি—
এবং দেখেছিও।

ফিরে আয়

শাশঙ্ক কুমার সরকার

তালাক, তালাক, তালাক ;
সাবাশ ! বেশকিয়া ভাই বেশকিয়া ।
রাংচিতের বেড়া ভেঙ্গে কচিগাছগুলো মুড়ানোর
এই তো অনুদান ।

তুমি কিন্তু বাপের বাধ্য ছেলে
বিয়ের পিঁড়ি থেকে কেমন উঠে এলে
মেয়ের বাবা নগদ কিস্তি দেয়নি বলে ।
সত্যি যা নেবে তাই সাড়ে ছ আনা
এমন কি একটা মানুষ পর্য্যন্ত ।

দুগ্ধ পোষ্য দায়বদ্ধতায়
কবন্ধ ভালোবাসা আর কতদিন ?
তাই বলি—তুমনে বহুত কিয়া ভাই বহুত কিয়া
আমরা এখন চাই ষোল আনায়
গোটা একটা মানুষ ।

স্বদেশের মানচিত্রটা কোথায়

পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশের মানচিত্রের একটা নির্ভুল
মাপ নিতে গিয়ে অঙ্কের হিসেবটা
অমিল থেকে গেল বারবার।
কে যেন হৃৎপিণ্ডটা ছিনিয়ে নিয়েছে তাঁর
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার কোন চিহ্ন নেই
আছে শুধু একটা বুকচাঁপা অর্ত্তনাদ।
ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতি, কেউ অভিন্ন নয় সেখানে।

এখানে ওখানে মাথা চাড়া দেওয়া
বিচ্ছিন্নতাবাদ। মূর্দাবাদ ধ্বনিতে চাপা পড়ে না।
দেশের অখণ্ডতা ভূ-লুণ্ঠিত। ব্যর্থতায়
ঘেরা ঐক্যের আহ্বানে—সাম্য মৈত্রী পানে।

সে ফাটল রুখতে হবে। প্রয়োজনে মৃত্যুর
ডাকে, সাড়া দিয়ে ভূগোলের ছকে বাধা
'মানচিত্র' একটা রেখার টানে।

বাণী বন্দনা

শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

ম নের মন্দিরে—শুনি বীনার নিক্কণ ।
নো য়াইল শিরঃ-ব্যস-চ্যবণ নন্দন ॥
নী রজে-শোভিছে-পদ-সদাই শুভদা ।
ত প্রেমে-হেম, মধু বদ্ধ প্রিয়ংবদা ॥

হ ইলনা কাব্যোছানে প্রবেশ আমার ।
ই তরে বিতরে কেবা গজমতি হার ॥
লেখনী তুলিয়া দিলে রবি কবিবরে ।
প্র দান করিলে বীনা কালিদাস করে ॥

কা লে ভদ্রে ! দেখা দিও এ মিনতি পনে ।
শ রণ লইনু মাতঃ ! লেখনী সম্পাতে ॥
ক বিদের কোবিদের তুমি কণ্ঠমালা ।
রি রংসু করিছে তিনি কাব্যাকাশ আলা ॥

বে দান্তের যুগ হতে তুমিতো প্রেরণা ।
ন ন্দন যাচিছে মাত্র ধুলি এক কণা ॥

মার্জিনের অংশ সাজাইলে যাহা হয়,
মনোনীত হইলে প্রকাশ করিবেন ॥

পনের উপমাতে একটি কবিতা

বিবেকানন্দ পাত্র

কিছু ভাল লাগে না পনের দিন হ'ল।
ঘরের গুমুটে অন্ধকারে এক নিস্তব্ধতা। পনের ভাষায়—
কবিতার অনুবাদ শুনছিলাম।
এক কবি পনের বছর ধরে অনুবাদ করছেন।

দুরূহ নগ্নমূর্ত্তির কিছু অহঙ্কার—
স্খলিত পদে অনেক ভুল—রাস্তায় রক্তের দাগ
সূর্য্যের অন্তর্বাস—কণ্টাকীর্ণ উলঙ্গ স্নায়ু—
ঋতুমতী নিঃশ্বাস—স্মৃতি নিয়ে বাঁচা—ফুলেদের প্রতিশ্রুতি—
পরভাষী—পৃথিবীর গন্ধ—পাথরের গল্প—
ঝরা বকুলের দুঃখ—অবিবাহিত সাদা কাগজ—
একমুঠো ভাত বা মাটি—
মানুষের একটা দিন একটা মন্ত্র বা স্মরণীয়······

এক কবি এই পনেরটি উপমাতে এখনই সৃষ্টি করলেন
একটি কবিতা এবং আগামী প্রজন্ম।

ঈশ্বরের প্রতি অপমান

পাঁচুগোপাল রায়

ঈশ্বরের সাধণায় আধ্যাত্মিক পথে উত্তরণ
ঈশ্বরের সাধকেরা সিঁড়ি পথে উঠে উর্দ্ধলোকে
সাধণায় সমদৃষ্টি, সাম্যমন্ত্রে অনন্ত আলোক
সাধণায় শান্তি আনে, দেশ আর দেশের মঙ্গল।

মন্দিরে ভয়াল দর্প, রণতূর্য , অসির ঝঙ্কার
বারুদের অট্টহাসি, কালি মেঘে উন্মত্ত উল্লাস
ছিন্নমস্তা পিপাসায় ভ্রাতৃহত্যা, বিবেক-বিক্রয়
মন্দির হৃদয়ে কেন মসিময় মহা-কালকূট ?
স্বর্ণমন্দিরের কান্না, পাঞ্জাবের এই ঘনঘটা
বিচ্ছিন্নতা চিন্তাধারা, রক্তস্নাত উদ্ধত নিশান
আকাশে শকুন হাসে, রক্তনদী উতলা উদ্বেল
দেশপ্রেম অগ্নিমন্ত্রে চাই আজ ইস্পাত সংহতি।

মন্দির মসজিদ গির্জা সাম্য আর সাধণার মহাপুণ্য স্থান
বন্ধহোক বিভীষিকা, ধর্ম আর ঈশ্বরের প্রতি অপমান ॥